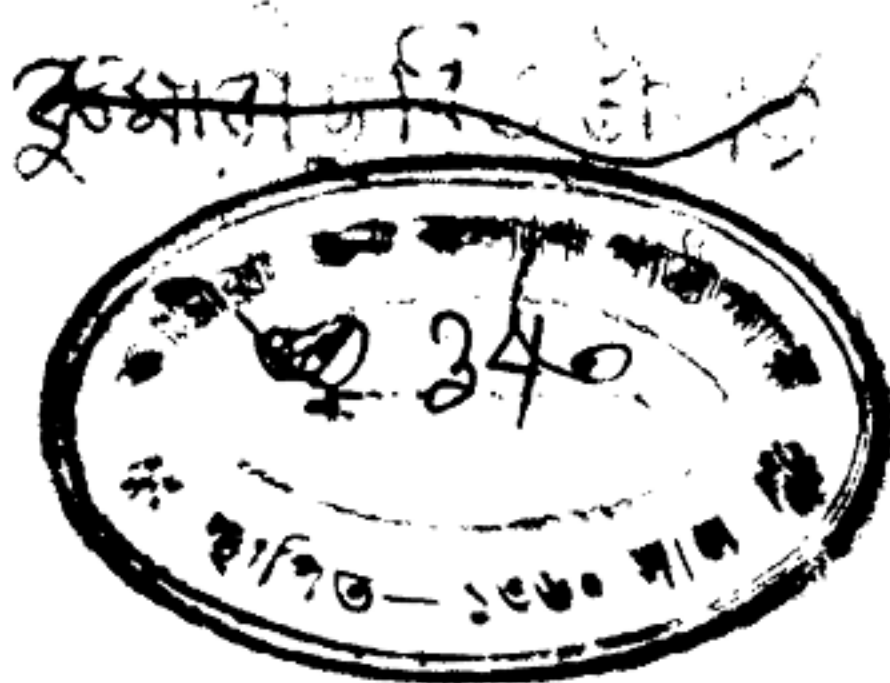


ଆବେଦନ ପତ୍ର



ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚରଣ

Kumari Chhabi Bhattacharyya.
Class.....Sec.....Roll.....



প্রকাশক
ডিব্লনস্
৩২ সোয়ালো লেন,
কলিকাতা ।

দাম—দেড়টাকা ।

প্রিন্টার—
শ্রীবঙ্কিম বিহারী বেরা ।
পাথের প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭১ বি, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট,
কলিকাতা ।

নং উৎসর্গ

ডাক্তার অতুল কৃষ্ণ রক্ষিত বি-এস-সি, এম-বি

ডি এম আর ই (লণ্ডন) এল্ এম (ডাবলিন)

বন্ধু

‘অভিন্ন হৃদয়’ যাকে বলে, তুমি ছিলে আমার তাই। জীবনের চাঁদের আলোতে এবং ঝড়ের রাতে উৎসবের দিনে আর রোগশয্যায় তোমার আমার মধ্যে কখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি। এমন নিবিড় ক’রে গভীর ক’রে একান্ত ক’রে আর কাউকে ভালোবাসিনি, আমিও না, তুমিও না। হঠাৎ যেদিন মাঝ পথে তুমি চ’লে গেল আমাকে একলা ফেলে, সেদিন থেকে পৃথিবী আমার শূণ্য হয়ে গেছে। সাহিত্যসাধনায়ও মন নেই। আমাকে তুমি যেমন বুঝেছিলে, তেমন ক’রে আর কে বুঝবে? মোটরে, নৌকোতে, ষ্টীমলঞ্চে, পদব্রজে, তাসখেলায়, গল্প করায়, হোল্ডিতে, বিজ্ঞায়, সিনেমায়, মন্দিরে, যখন তোমাকে সঙ্গী পেয়েছি, আনন্দ আমার বোল কলার পূর্ণ হয়েছে। রাজস্বার থেকে শ্মশান অবধি গিয়ে আমার কর্তব্য শেষ হ’ল, কিন্তু স্মৃতির বেদনা র’য়ে গেল চির-জীবনের। তোমার মতন বন্ধুকে কেউ ভুলতে পারে না। তোমার মতন বন্ধু কেউ পায় না।

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

ভূমিকা

অভিশপ্ত বংশ রংমশালে যখন প্রকাশিত হয়, তখন মাসের পর মাস যারা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিল, আজ তাদের দেখা পেলেন হয়! আশ্চর্যের কথা এই যে, স্নেহাস্পদ প্রকাশকরাও শিশু মন নিয়ে গল্পটি শেষ করে, এবং উৎসাহের সঙ্গে প্রচারে উদ্যোগী হয়। শ্রীমান্ মুপ্রকাশ সেনও নির্ভর সঙ্গে ছবিগুলি এঁকেছে। আমার লেখা যারা পছন্দ করে, তারা বুঝতে পারবে কীকি দিতে আমি চেষ্টা করিনি। যাদের ভালো লাগবে তাদের সংখ্যা যদি যথেষ্ট হয়, তাহ'লে প্রদীপের পরবর্তী জীবনের কাহিনী পরে বার করা যাবে।

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট

পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলকাতা

আড়িঙ্গ প্রবন্ধ

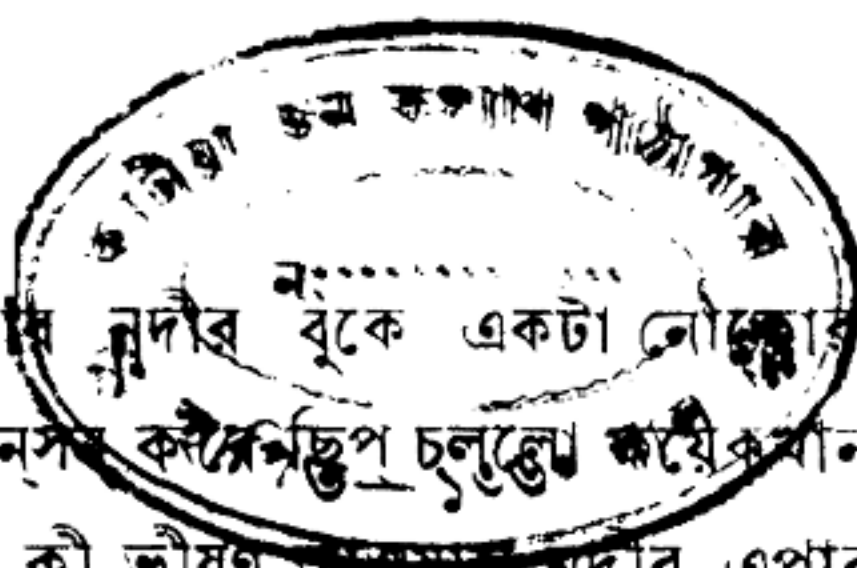
ধনীর বিশেষ ক'রে অত্যাচারী ধনীর, ধন লুণ্ঠন ক'রে তারা বিলিয়ে দিত দরিদ্র নিরীহদের হাতে ।

অর্থীভাবে অন্নভাবে গরীব বিধবারা যখন রুগ্নশিশু কোলে নিয়ে ক্রন্দন করছে, হঠাৎ তাদের হাতে মোহরভরা থলি এসে পড়েছে কত দিন । কে দিলে, কেন দিলে, তার কোন পাত্তা নেই ।

হারাণ তাঁর পুত্র বিশ্বেশ্বরকে এ সব ব্যাপার থেকে অনেক দূরে রেখেছিলেন এবং ভালো শিক্ষকের হাতেই তার পড়ার ভার দিয়েছিলেন । নানান বিষয় মেধাবী ছাত্রের মতন বিশ্বেশ্বর অধিগত করছিল । কিন্তু অনেক রাত্রে পিতা আসেন না, এ সংবাদও তার কাছে গোপন রইলো না ।

রাশি রাশি টাকা নিয়ে এসে ভোররাত্রে আলো জ্বলে বাইরের ঘরে ভাগ-বাটোয়ারা ; মাঝে মাঝে পুলিশ ধ'রে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে মায়ের কান্না ; আত্মীয়স্বজনদের বকাবকি ; সব কিছু জড়িয়ে বিশ্বর শিশুচিত্ত এক অজানা আশঙ্কায় ছলে উঠত । ছলতে ছলতে কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভীকু ভাবটা কেটে গিয়ে বেরোয়াভাবের উদ্বেক হল, দলের অন্য অন্য সঙ্গীদের কাছে নানা বীরত্বের গল্প শুনে শুনে তার মনেও ঐ রকম অসমসাহসিক কিছু করবার বাসনা জাগলো । পড়াশোনা উঠলো মাথায় ।

নিতাস্ত ছোট যখন সে, তখন থেকেই এক সাক্ষীদের কাছে লাঠি খেলা তার শেখা হ'ল । শেষে এক রাত্রে সে গিয়ে বসলো এক চরে ।



অভিযাত্রী

অন্ধকার নদীর বুকে একটা নোঙর আলো দেখা গেল, তারপর সনসন করে চুলকুনি দিয়ে কয়েকখানা। ‘আর হারে রে রে রে!’ কী ভীষণ আতঙ্কিত নদীর এপার ওপার কাঁপিয়ে— তারপরেই মেয়েদের গলার আকুল আত্ননাদ। পিতার আড্ডা কুমুমপুরের চর থেকে বিস্তৃত এই সব শুন্লো। ফিরে এলো খাড়িটায় সীতার কেটে।

বৃদ্ধ বয়সে হারাণের দল যখন ভেঙে গেছে প্রায়—এলো তৈরী হ’য়ে বিস্তৃত সর্দার তেল পাকানো বাঁশের লাঠি নিয়ে। ‘বিস্তৃত ডাকাত’ ‘বিশেষ ডাকাত’ প্রসিদ্ধ হ’য়ে গেল গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলায়।

লম্বা লম্বা রণপায় চ’ড়ে বিদ্যুৎগতিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক’রে তারা লুটের মাল উত্তর বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় নিয়ে যেত।

রক্তে রাঙা হ’য়ে যেত নদীর জল, রক্তে রাঙা হ’য়ে যেত বাঁধানো আঙিনা। তিন টাকার জন্ম বিস্তৃত খুন করত। বিস্তৃত ডাকাতের হাতে কারুর নিস্তার ছিল না।

বৃদ্ধ রুগ্ন হারাণ বার বার বলতেন—ওরে, এত পাপ সহিবে না। দুর্বলের ওপর অত্যাচার করিস্ না। আর প্রাণে মানুষকে মারিস্ না। আজ অবধি আমার হাতে মরেনি কেউ।

রাখো তোমার ধর্মতত্ত্ব—বিস্তৃত গর্জন ক’রে উঠত। যে হারু সর্দারের ক্রী একটু কুঁচকে গেলে সা-জোয়ান লোকরা

আড়িঙ্গ বৃক্ষ

কাঁপতে থাকত, আজ সে জরাজীর্ণ ব'লে সেদিনকার-ছেলে বিস্ময় তাকে উপহাস ক'রে যায় ! বাপ হ'লেও এতটুকু মানে না । গায়ের জোরে, দলের প্রতাপে বিশ্বেশ্বর তখন ধরাকে সরা দেখছে ।

হরিণডাঙা গ্রামের ছিটেবেড়ার ঘরে হাঁপানী রোগী সারা রাত কাসে, কাঁথায়, বালিশে সেলাই করা বেচারার কটাई বা টাকা আছে ?

রাত দুটোয় এক ধাক্কায় ভাঙা দরজা ভেঙে পড়লো—বুড়ি জিগোস করলে—কে পেসন্ন এলি ?

প্রসন্ন বুড়ীর ভাই পো ।

উত্তরে একটা ছ' ব'লেই গলায় পড়লো হাত । খানিকটা ছটফটানি, তার পর সব শেষ । অপঘাত মৃত্যুর মুখে বুড়ি জেনে গেল তার ভাইপো তাকে প্রাণে মারলে, থাকে সে মানুষ করেছে । বিছানা বালিশ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে পাওয়া গেল একশো পাঁচ টাকা । তারই জন্তে একটা প্রাণী হত্যা হ'য়ে গেল ।

জমিদারের বাড়ীতে সন্ধ্যারাত্রে ডাকাত পড়লো । দরওয়ান বেহারি বিস্ময় ডাকাতের নামেই তটস্থ, বাধা দেবে কি ? গ্রামের লোক বিস্ময় ডাকাতের গলার আওয়াজেই কাঁপছে, বেরোবে কি ! দরজার পর দরজা ভেঙে অবলীলাক্রমে বিস্ময় এগিয়ে চললো । জমিদারকে বেঁধে বিষম মারলে । মেয়েদের

শিশুদের কাউকে বাদ দিলে না। ধর্মভীরু জমিদার অনুনয় ক'রে বললেন—যা নেবার সব নাও, প্রাণে মেরোনা।

বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো, বড় ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, সিন্দুক ভেঙে যথাসর্বস্ব ধনসম্পত্তি, মেয়েদের গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিয়ে ধানের গোলা লুট ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। গ্রামের চালা গুলো ধরে গেল। বোম্ কালী, বোম্ মহাদেব, হু-হু বোম্ বোম্,—পাপমুখে ভগবানের নাম করতে করতে বিশুড়াকাতের দল রণপায় চ'ড়ে বসলো।

পাঁচদিন পরে যে দারোগা তদন্ত করতে এলো, যারা সাক্ষী দিতে গেল, সকলকার মৃতদেহ নদীর স্রোতে ভেসে চললো।

রাত ছেড়ে সে দিনে ডাকাতি শুরু করলো। বিশু সর্দারের ভয় নেই। কোনখানে কোন প্রমাণ সে রাখত না।

হারান তখন মারা গেছেন। দলে এসেছে ভাঙন, এসেছে বিশ্বাসঘাতকতা। বিদ্রোহ করছে সব।

সেই সময়ে একদিন ঘন জঙ্গলে মহারানী বসন্তকুমারীর হাতিতে গভর্ণমেণ্টের রাজস্বখাজনা চলেছে, বিশু আটকালে পথ। মালতকে বললে, হাতির মাথায় মারো ডাঙস, করো তাকে পাগল। আমাকে টাকা দিয়ে মানে মানে প্রশি বাঁচাও।

পাগলা হাতি বন থেকে বনে ছুটে চললো। ঠিক দিনে সদরে খাজনা জমা হলোনা। নীলামে উঠলো জমিদারী,

অভিশপ্ত বৃক্ষ

কিনে নিলে বিশ্বেশ্বর মল্লিক, মহারাণী বসন্তকুমারীর সেরা সেরা
মোজা ও তালুক।

সেই থেকে তিনি জমিদার মহলন্দপুরের। লোকের চোখে
সম্মানিত, রাজার দরবারে সমাদৃত।

স্ট্রী পরিহাস করলে বললেন—বাংলার কথা ছেড়ে দাও,
ভারতবর্ষে ক'জন জমিদার আর রাজা মহারাজা আছেন, নাম
করো ত' যাদের পূর্বপুরুষ ডাকাত ছিলনা ?

তারপর উঠলেন রাজার ধারে প্রাসাদ। তারপর হ'ল
পড়বার ইচ্ছে, আর বইয়ের সখ। এলো মাইনে করা
অধ্যাপকরা।

বিশ্বেশ্বর রাজসাক্ষী হ'য়ে ধরিয়ে দিলেন তার দলকে। কেউ
গেল ফাঁসী, কেউ বা ছাঁপাত্তর। তিনি মুক্তি পেয়ে আরাম-
কেদারায় গিয়ে বসলেন। তাঁর 'দক্ষিণ হস্ত' কুঞ্জলাল বধমঞ্চে
ওঠবার আগে ব'লে গেল, খুন জখম রাহাজানি—কিছুই তুমি
বাদ দাওনি। আমরা যা কিছু করেছি—সবি তোমার লুকুমে।
করেছ রাশি রাশি অশ্রায়, তারপর আমাদের ধরিয়ে দিয়ে নিজের
সাধু সেজে স'রে গেলেন ! এতখানি পাপ কি ভগবান সহ্য
করবেন ? আইনের বিধান এড়িয়ে গেলে, কিন্তু বিধির বিধান
কি এড়াতে পারবে সর্দার ? আমি ত এই মুহূর্তে ম'রে শাস্তি
পাব, কিন্তু তোমার জীবনে তিল তিল ক'রে যে মৃত্যু যন্ত্রণা, তার
কথা কি ভেবে রেখেছ ?

বিশ্বেশ্বর শুধু হেসেছিলেন।

ভগবান কি আছেন? যদি থাকেন, নিদ্রিত। কত অগ্নায় পৃথিবীতে নিত্য হ'য়ে যাচ্ছে, কত অত্যাচার, কত অপরাধ, কী শাস্তি তার দেখা যায়?

হোম যাগ যজ্ঞ পাঁঠাবলি উপাসনার ঘুম দিয়ে মানুষ কি অনায়াসে মুক্তি পাচ্ছে না?

টাকার গদির ওপর ব'সে বিশ্বেশ্বর পরম নিশ্চিন্ত মনে মৃদু হাস্য করেন মাত্র।

সাত ছেলে চার মেয়ে তাঁর।

বড় ছেলে আর বড় মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে—ঘর আলো করা বৌ, সভা উজ্জল-করা জামাই।

অন্য ছেলেমেয়েগুলি স্বাস্থ্য বুদ্ধিতে শক্তিতে দীপ্ত।

স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারকে সুখের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তিনি লাইব্রেরীঘরে ঢোকে। দেশ বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার, গ্রন্থউপগ্রহের অসংখ্য খবর। রঙীন কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো ক্রমে পড়ে তাঁর প্রসন্ন মুখে, বিদ্রী অতীতকে তিনি তুলতে চান, রমণীয় ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তুলতে চান। দেখতে চান বিশ্বত অতীতের ওপর অনাগত ভাবী কাল তাঁর জন্তে কত পরিতৃপ্তি নিয়ে আসে।

দশহরায় বাড়ীর পাশে গঙ্গাস্নানে গেছেন, ছোট ছেলে তাঁর চোখের সামনে ডুবে গেল, কিছুই করতে পারলেন না।

আভিষেক বৃত্তান্ত

দিন পনেরো বাদে অম্লের গ্রাস সবে যুখে তুলেছেন—বড় মেয়ে একেবারে পাগল হ'য়ে ফিরে এলো খবর নিয়ে জামাই মারা গেছে হার্ট ফেল ক'রে।

ঝড়ে বাগানের গাছের ডাল ভেঙে প'ড়ে সেজ ছেলে পড়লো আর মরলো।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন—বিধাতার বিচার শুরু হয়ে গেছে।

প্রতিকার করতে বেরোলেন।

গ্রামের প্রান্তে বিধবা নিস্তারিণী একটি ছেলে নিয়ে থাকে। সেদিন অপরাহ্নকালে সেই ছোট ছেলেটিকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন। সেদিনও পৃথিবী কাঁপিয়ে ঝড় উঠলো, নিস্তারিণীর ছেলে ফিরে গেল না। অরণ্যের মধ্যে পুরাতন ডাকাতে-কালীর সামনে যে এক নরবলি দেওয়া হয়েছিল সকল গ্রাহের শাস্তির জন্তে, সে কথা তার মা জানলো না। 'ফিরিয়ে দাও' 'ফিরিয়ে দাও' ব'লে অর্দ্ধচন্দ্র পেয়ে সে ফিরে গেল।

বছর না ঘুরতেই পঞ্চম পুত্র আর ছোট মেয়ে এমন করে পড়লো যে ছ'মাসের বেশী বাঁচলো না।

নিজে পক্ষাঘাতে পড়ু হ'য়ে বিশ্বেশ্বর শুনলেন—বড়ছেলের কুষ্ঠ দেখা দিয়েছে, বড় বৌ আত্মহত্যা করলো। এক একটা আঘাত শেলের মতন এসে বৃদ্ধের জীর্ণ বুকে বিধিতে লাগলো।

বংশ যখন যেতে বসেছে, তখন তাঁর নজর পড়লো বড় নাতি—একমাত্র পৌত্র প্রদীপের দিকে। রুগ্নকণ্ঠে তিনি

আভিষেক

আর্তনাদ ক'রে বললেন—বাঁচাও, ওকে আগে বাঁচাও। বাঁচাও
ওকে সমস্ত বিপদ থেকে। ও থাকলে, আমার সব থাকবে।

সেইদিন সেই যুহুর্ন্তে ঘুমন্ত প্রদীপের গলা কে টিপে
ধরেছে।

টিপে ধরেছে তার মেজকাকা।

সহজ মানুষ, বেশ ছিল, হঠাৎ কখন পাগল হ'য়ে গেল।

প্রদীপ ঘুমোচ্ছিল, শাঁখের মতন সাদা, ফুলের মতন নরম
গলাটি দেখে তার মনে হল চেপে ধ'রে দেখা যাক, কি হয়!
পাগলের ত কাণ্ড!

শেষ হ'য়ে যেত ছেলেটা, বাঁচালো পার্বতী, পাশ থেকে
এসে ধাক্কা দিয়ে মেজবাবুকে সরিয়ে দিলে, সরিয়ে দিতেই সে
রেগে দিলে তার আঙ্গুল কামড়ে, রক্তারক্তি কাণ্ড।

লোকজন ছুটে এসে পাগলকে বেঁধে ফেলে।

সেই পাগল থাকে বাঁধা এক ঘরে, মাঝে মাঝে চোঁচায়।

ছুই মেয়ে পর পর বোবা হ'য়ে গেল, পাগলের বাড়া, কথা
কয় না, ন'ড়ে বসে না। খাইয়ে দিলে খায়, নয়ত না। রাত
ছপুরে কী এক রকম শব্দ করে।

আভিষেক রত্ন

বাড়ীটা যেন চিড়িয়াখানা ।

দাহুর অ্যালবাম খুলে একখানা ফটো দেখছে প্রদীপ—
ঝুলের মতন কালো একটি মেয়ের, মুখ চেনা যায় না, কাপড়
পুড়ে গেছে, চুল পুড়ে গেছে—বীভৎস চেহারা—পার্বতী বলে
তার মা মারা যাবার পরে পুলিশ এই ফটো তুলেছিল। ভয়
করে দেখলে ।

একদিন বিকেলে সদর অন্তরের মাঝামাঝি দালানে একটি
লোককে আসতে দেখেছিল, মুখটা ফুলো আর লাল, এক দিকটা
যেন গ'লে গেছে—দাহু ছুটে এসে বললেন—যাও, যাও তুমি
আবার এসেছ কেন ? তোমার ছেলে ভয় পাবে। বেরিয়ে
যাও, বেরিয়ে যাও এখনি ।

হাতে-পায়ে শ্যাকড়া জড়ানো অবস্থায় লোকটি তবু ভিতরের
বারান্দার রেলিং ধ'বে দাঁড়িয়ে রইলো । দাহু অনেক চেষ্টামেচি
করলেন, পার্বতীকে বললেন—খোকাকে টেনে নিয়ে যা, ও ভয়
পাবে ।

পার্বতী বলে, ঐ নাকি তার বাবা ।

অন্য কাকারা ছুটে গেল তার বাবাকে ধ'রে বার ক'রে দিতে
—একটা গোলমাল উঠলো—ওরা বলতে লাগলো—রস
লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের গায়ে—সর্বনাশ. আমাদেরও কুষ্ঠ
হবে' 'বেশ করব' 'খুব করব' 'খুন করব'—কী গোলমাল

অভিযান্ত্র বৃত্ত

ছোটোপাটি ! প্রদীপ ভয়ে কাঁটা । তার চোখ দিয়ে ঝরঝর
ক'রে জল ঝ'রে পড়লো, তার বাবাকে সে দেখতে পেলেনা
ভালো ক'রে । হ'লোই বা খারাপ দেখতে, তবু ত তার বাবা !
বাবা হ'লেই ত ছেলেকে ভালোবাসেন । হয়ত তিনি
ভালোবাসতেই এসেছিলেন !

কেন এসেছিলেন, সে ছবাব মাষ্টার মশাইও দিতে
পারলেন না ।

এখন সে ইংরেজী পড়তে শুরু করেছে । বাক-বাক নতুন
বই—MODERN READER .

কালো রঙের অনেক ছবি আছে । রঙীনও কয়েকখানা ।
সমস্ত ছবি সে দেখে শেষ করেনি, সব পাতা ওল্টায়নি, পাছে
সব ছবি দেখা হ'য়ে যায়, আর কিছু দেখবার না থাকে ।

একখানা ভালো ছবি আছে মাঝখানে, সেটি শুধু আগেই
দেখেছে, সীতাকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে জটায়ু পাখীর পাখার
দিকে অস্ত্র তুলেছে রাবণ । কষ্ট হয় দেখলে ।

.মাষ্টারমশাই বলেছেন, রবি বর্ম্মার আঁকা বিখ্যাত ছবি
ওখানা । কে রবি বর্ম্মা ? উনি বলেছেন—রাজা রবি বর্ম্মা ।
কোনো রাজা এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারে ? সে ভাবতে
পারে না ।

মাষ্টারমশাই বলেন, পড়ো ।

ও পড়ে—That cat on the mat can catch

অভিশপ্ত বন্দন

a bad rat. কী শব্দ মানে ! কিছুতেই মনে থাকে না ।
সে এখন যোগ দিতে শিখেছে । ৪৯৬ লিখে তলায় ৫৮৭
লিখলে আঙুলে গুণে গুণে সে যোগফল লিখে দিতে পারে ।
খুব তাড়া দিলে হবে না । একটু সময় দিলেই হবে ।

পড়া হ'য়ে গেলে মাষ্টার মশাই তাকে বেড়াতে নিয়ে যান,
বেশী দূরে নয়. গঙ্গার ধারে ।

যেদিকে বাজার আছে, অনেক বাড়ী আছে, অনেক লোক
আছে, সেদিকে নয় । যেদিকে কেউ নেই, শুধু সেইদিকে । একটু
অন্ধকার হয়ে গেলে হৃদে কুমীর দিকে লোকে আসতেই চায়না ।
সবাই বলে—এ বাড়ীতে ভূত আছে । ভূত থাকলে কখনো
প্রদীপ থাকতে পারে ?

একটা প্রকাণ্ড ঘরে সে একেবারে একলা শোয় শুনে বাবী
ব'লে মেয়েটা অবাক হয়ে পেল ।

ফুল তুলতে এসেছিল সে । তাদের বাড়ীতে পূজো । তার
ঠাকুমা বললে—যা ঐ বড় বাড়ীতে যা । ওখানে অনেক ভাল
ভালো ফুল আছে । চুপি চুপি নিয়ে আয় ।

মানী ত'রুকেই দেয়না । অনেক বলে করে প্রদীপ তাকে
রাজী করায় । বলে—আহা নিকনা ছেলেমানুষ !

শুনে বাবীর হাসি পায় । ঐ ত এককোঁটা ছেলে, ও আবার
তাকে বলে ছেলেমানুষ । মনে মনে বলে—আ-রে ছেলেটা !

সংসারে কারুর ভালো করতে নেই ।

অভিযাত্রী

প্রদীপের জন্মেই ত বাবী কোঁচড়ভরা ফুল পেল, আঁচলে ত রীতিমত একটা পোঁটলা বাঁধা হল, কিন্তু যাবার সময় না একটা ধন্যবাদ, না একটা মিষ্টি ক'রে—আসি ভাই!

রাগে প্রদীপ কথাই বলতে পারলেন না।

অনেক কথা আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অত কথা সে জানেই না!

মেয়েটা কিন্তু প্রদীপের চেয়ে ভালো আছে বলতে হবে! যে বাঁশবাগানের ওপারে কী আছে প্রদীপ জানেনা, তার মাঝখান দিয়ে একলা মেয়েটা চ'লে গেল, কতক্ষণ অবধি তার টক্টকে লাল শাড়ী আর কুচকুচে কালো পাড় দেখা যেতে লাগলো—তারপর সে মিলিয়ে গেল। ওখানে হয়ত মাঠ আছে, সবুজ রংএর ক্ষেত আছে, কিম্বা লাল নীল সাদা গোলাপী একতলা দোতলা সব বাড়ী আছে, দূরে দূরে খোলার চাল ও খড়ের চাল দেওয়া কুঁড়ে ঘর আছে, কত কী থাকতে পারে। হাট বাজার এমন কি রেল স্টেশন পর্য্যন্ত।

ওদিককার কোনো খবরই প্রদীপ জানে না। মাঠার-গশায়ও যেতে দেন না।

বড় বড় নারকোল ও তালগাছের সিরসিরে পাতাগুলো ঝিরঝিরে হাওয়ায় ছলে ছলে তাকে যেন ডাকে—দেখবে এস এখানে কি আছে।

মেঘগুলো ভেসে ভেসে ওদিকে চলে যায়, পাখীরা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

যায়—তারাও যেন ব'লে যায়—দেখবে এসো এদিকে কা
আছে !

বাবী যেদিকটা থাকে, সেদিকটা রহস্যময় না হ'য়ে যায়না ।
নইলে ও কোথা থেকে অত অফুরন্ত হাসি আর চঞ্চল গতি পায় ?

কাকাদের আর পিসিদের সে দেখতে পায় না । সমস্ত
বাড়ীটায় সব ঘর শূণ্য, শুধু লাইব্রেরী ঘরে আর তার পাশের
ঘরে প্রদীপ আর দাছ ।

মাঝে মাঝে—বছরে চারবার—বারবাড়ীর ঘরগুলো খুলে
যায়—প্রজাদের খাজনা জমা নেবার জন্তে নায়েব খাজাফিরা
পাততাড়ি খুলে বসে, তারপরে তারা কোন্ কাছারি বাড়ীতে
চ'লে যায় ।

সেই সময়টা টাকার ঝন্ঝন্ আওয়াজ, রাশি রাশি নোট
আর রেজকি গোণার ব্যস্ততা, হাতে পায়ে ধরা, হুঙ্কার—সমস্ত
নিস্তব্ধ বাড়ীটাকে গম্গম্ ক'রে তোলে ।

তারপরে আবার দীর্ঘ বৈচিত্র্যবিহীন দিনগুলি । অনেক
রাত পর্যন্ত খটাস্ খটাস্ ক'রে দাছর খড়মের আওয়াজ, আর
ঝিলঝিলির ওপারে অন্তরের দিক থেকে 'মারলে' 'মেরে
কেল্লে' আর্ন্তনাদ, কালপেঁচার ডাকের সঙ্গে ; অর্ধেক রাত

পার হ'য়ে যায়। অল্‌অলে শুকতারা নিয়ে ভোরের আলো
আসে প্রথম তার শিয়রের জান্না দিয়ে সমস্ত ভয় দূর ক'রে।
ভারী আরামের ভারী ভরসার ভোরের আলো।

একটা নেম্পতিবার বাবী এলো সকালে ফুল নিতে।

প্রদীপ বলবার আগেই বললে—আজ আমি ছপুরে তোমার
সঙ্গে গল্প করতে আসব। একলাটি থাকো। আমার নাম স্নিগ্ধা,
ডাকে বাবী ব'লে। তোমার যেটা খুসি বোলো। তুমি বোধ
হয় আমার চেয়ে একটু আধটু বড় হবে। তা হোক্‌গে বাপু
তা ব'লে আমি দাদা বলতে পারব না। প্রদীপই বলব।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা ব'লে বাবী চ'লে গেল।

সত্যি এলো সে ছপুর বেলায়। প্রদীপ চেয়ে ছিল বারান্দা
থেকে সেই বাঁশবনের দিকে। আঁচল ছলিয়ে ছলিয়ে বাবীকে
আসতে দেখে খুসিই হল।

সমস্ত ছপুর সমস্ত বিকেল কী যে গল্প হল তার ঠিক নেই,
বাবী এত বক্তৃতাও পারে! আর প্রদীপের ভালো লাগাকেও
বলি! সঙ্গী পায় না বেচারী!

'চলো ত দেখি তোমাদের লাইব্রেরী ঘর।' প্রদীপকে
ঠেলতে ঠেলতে বাবী চললো।

দাছ তখন ছিলেন না, তিনি ছাতে।

সে ঘরে শুধু বই নয়, দেশবিদেশের আশ্চর্য্য সব সংগ্রহ
ছিল—মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কাজ, লঙ্কো ও কৃষ্ণনগরের

আভিষেক রত্ন

মাটির তৈরী খেলনা, জয়পুরের আগ্রার গয়ার মার্বেল, সাদা ও কালো পাথরের শিল্প, মহীশূরের চন্দনকাঠ ও কাশ্মীরের চিত্রবিচিত্র কাঠের কারুকার্য, পাটলীপুরের পুরাতন শিলালিপি কত জিনিসই না থরে থরে সাজানো। একটি একটি করে নিবিষ্ট মনে দেখতে হয় সারাদিন ধরে।

দরজার পাশে একটা মানুষপ্রমাণ কালো নিগ্রো মূর্তি ছিল কাঠের না কিসের তৈরী। সে নাকি মিশর না কোন্ দূর দেশ থেকে আনা। সেই মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়ে বাবীর অন্তরাঝা শুকিয়ে গেল। মুখটা অবশ্য খুবই বীভৎস।

কিন্তু তারো চেয়ে ভয়ের কথা আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যে কথা মনে করতে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়।

প্রদীপের কাঁধে হাত রেখে জড়িয়ে ধরে বাবী বললে—
চলো ভাই, আমরা ওঘরে যাই।—তার গলার স্বর কিন্তু কাঁপছিল সেতারের তারের মতন। প্রদীপ বুঝতে না পেরে বললে—কেন?

কেন আবার কি! দেখা ত' হল সব।

একেবারে বাইরের বারান্দায় প্রদীপকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সামনে পিছনে চারিধার দেখে অস্ফুট কণ্ঠে বাবী বললে—ও মূর্তিটার চোখ নড়ে?

হেসে প্রদীপ বললে—চোখ নড়বে কি? চোখের জায়গাটা ত কাঁকা। ভেতরটা একদম ফাঁপা।

মানুষ ঢুকতে পারে ভেতরে ? বাবীর ব্যাঘ্র প্রশ্ন ।

তা পারে বৈকি ।

তাহ'লে কেউ ঢুকেছে । আমি স্পষ্ট দেখেছি চোখের তারা
নড়ছে এদিকে ওদিকে । একবার আবার চোখের পাতা
ফেললে ।

প্রদীপ ত হেসেই বাঁচে না ! তা কী ক'রে হবে ?
ওখানটা অন্ধকার ব'লে দেখতে ভুল হয়েছে ।

চলো ত দেখি ।—সত্যি হলে দরোয়ানদের ডাকব । ভয়টা
কিসের ?

ভুজনে গিয়ে যেই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকেছে, দেখে দাছ বসে
আছেন । দেখেই রুদ্ধ গলায় বললেন—এ ঘরে কেন ?
যাও এ ঘর থেকে ।

দাছকে দেখলেই প্রদীপের গলা শুকিয়ে যায় । তবু
বললে—দাছ ঐ যে নিগোর মূর্তিটা আছে না, ওর চোখ
না ?—

এ রকম 'না' দিয়ে কথা দাছ পছন্দ করেন না, থামিয়ে
দিয়ে বলেন—কী বাজে বকছ ? ও মেয়েটা কে ?

ও বাবী ।

বাবী আবার কে ? ও কেন এখানে আসে ?

আমার বন্ধু ।

তোমার বন্ধু ? বাজী যেতে বলো । রাত হয়ে গেছে

আজিও বৃষ্টি

বাঁবী ততক্ষণে এগিয়ে গেছে মনে মনে অরসিক বুড়োর
মুণ্ডপাত করতে করতে ।

যাবার সময় বলে গেল—প্রদীপ ভাই তুমি আজ একটু
সাবধানে থাকো । আমি বলছি তোমার, ওর ভিতর কেউ
আছে ।

—তুমি ভাই আজ এখানে থাকো না, তাহলে আমার
সাহস হয় ।



প্রদীপের জগেই বাঁবী ফুল পেলে (পৃঃ ২১)

—বাঁবী গস্তীর হয়ে পাকা গিল্লীর মতন বলে—আমার
থাকার ভাই ঢের ঝগাট্ ! এদিকে তোমার দাছ বুড়ো, ওদিকে
আমার দিদিমা বুড়ি ছজনেই সমান । এও থাকতে দেবে না,
সেও থাকতে দেবে না । নইলে তোমাকে বিপদের মুখে
ছড়ে যেতে সত্যি আমার ভাবনা হচ্ছে ।

আডিশ্যু বঙ্গ

—তুমি কী ক'রে বাড়ী যাবে ? অন্ধকার হয়ে এলো ।

—ঐ ত একটু জ্যোৎস্না আছে । এক ছুটে যাব ।

বাবী আর দাঁড়ালো না ।

দাছ একটুক্কণের জন্তে বাথরুমে গেছেন, প্রদীপ মূর্তিটার মুখে টর্চ ফেললে—দেখলে ছোটো চোখের পল্লব যেন চমকে পড়ে গেল ! প্রদীপের শরীর তখন হিম হ'য়ে গেছে ।

বাপারটা ভালো লাগলোনা প্রদীপের । এর আগেও ত ও মূর্তিটা অসংখ্যবার দেখেছে, কখনও তার চোখ নড়তে দেখেনি । চোখ ত ছিলই না, তার তারা কোথায় ? সবটা ত ফাঁকা ।

মাকে মারল ওরও মনে হয়েছে পিচন দিক দিয়ে ভিতরে ঢুকতে । ডালাটা আর সবটো মূর্তিটা এত অসম্ভব ভারী যে নাড়াচাড়া করতে সাহস হয়নি । তাছাড়া মূর্তির মাথা পর্যন্ত ও পৌছতে না, অস্তুতঃ সাড়ে পাঁচফুট লম্বা লোক হওয়া চাই ।

খবরটা দাছকে দেবে কিনা ভাবছিল । কিন্তু দাছ যা গস্তীর । আর আজ ত সন্ধ্যা থেকে আকাশের তারা দেখছেন তিনি । ছায়াপথ নিয়ে নাকি একটা প্রবন্ধ লিখবেন কাকে বলছিলেন । মাষ্টারমশাই কিম্বা পার্কসীকেও কিছু বলা কি উচিত নয় ? ভৌতিক ব্যাপারও ত হ'তে পারে ? কিন্তু ভূতটা যদি চ'টে যায় ? কাজ নেই রাত্রে অন্ধকারে কোনো কিছু ক'রে । সকালবেলায় আলোতে দেখে না হয় ব্যবস্থা করা

আজিও রহস্য

যাবে। খাওয়াদাওয়া সেরে সে শুতে গেল। একলাঘরে তার শোয়া। অশ্রুদিন ভয় করে না, আজ করছে। বাইরে দালানে পার্বতী শোয়। তবুও।

দরজার খিলটা আর ছিটকিনীটা সে ভালো ক'রে বন্ধ করলে। মাথার দিকের জানাটা খোলা রইলো, তার আবার গরাদে নেই। ওদিক থেকে কেউ আসতে পারবে না। শুধু তারার আলো সেদিন পৃথিবীতে এসে পড়েছিলো। অন্ধকার পৃথিবীতে। ঘুমন্ত গাছগুলিতে অসংখ্য জোনাকী জ্বলছিল। যেন পাতায়-পাতায় মুকুলে মুকুলে আলো, ঝিকমিক ঝিক!

এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো, প্রদীপ জেগে জেগে ওঠলো।

একটার ঘণ্টাও ঢং ক'রে বেজে গেল। তখনো তার ঘুম আসছে না। যদিও বা একটু আসছে. কোথাও কিছু খুঁট ক'রে শব্দ শুনে চট্ ক'রে ভেঙে যাচ্ছে।

এবারে আওয়াজটা স্পষ্ট, দরজায় মিহি যন্ত্র চালাবার মতন যেন। ওপরের ছিটকিনীটা যেন নেমে পড়লো। খিলটা আস্তে আস্তে কে যেন তোলবার চেষ্টা করছে।

পাশবালিশটাকে চাদর ঢাকা দিয়ে খাট ছেড়ে প্রদীপ নেমে পড়লো। এধারের আলমারীর পাশে গিয়ে লুকোলো। চোর কিংবা ভুত যদি আক্রমণ করতে চায়, আগে পাশ-

অদ্বৈত-সংসার

বালিশটাকে কক্ক! সেখান থেকে শুন্তে পেল, খিলটা
আন্তে আন্তে সোজা হয়ে গেল। ছায়ার মতন একটা মূর্তি—
দেখা যায় কি না। বায়—তার খাটের দিকে এগোতে লাগলো।
কি করলে সেখানে, দেখা গেল না। তারপর জান্নায় উঠে
বাইরে পা বাড়ালো। ভূত নয়, ভূত অত স্পষ্ট হয় না, সাদা
কাপড় পরিষ্কার বোকা যাচ্ছে। ততক্ষণে দরজা দিয়ে বেরিয়ে
প্রদীপ পার্বতীকে ঠেলে তুলে বলেছে—চোর!

চোর! সঙ্গে সঙ্গে চীৎকারে দরোয়ান ও লোকজনেরা
উঠে পড়লো। চোর—চোর—চোর!

বিশ্বেশ্বর উঠলেন। চোর? কোথায় চোর?

জান্নার ধারে এসে বিশ্বেশ্বর দেখলেন টর্চ ফেনে—একটা
লোক জলের পাইপ ধরে সাবধানে নামছে, তার মুখে আলো
ফেনে তিনি চৈঁচিয়ে উঠলেন—চিরঞ্জীলাল!

ততক্ষণে নীচে সে ভূপভূমির ওপর লাফ দিয়েছে, পায়ে
লাগার দরুণ খানিকটা ধম্কে ব'লে তারপর অন্ধকারে ছুটে
আরম্ভ করেছে।

দরোয়ানরা ছুটে তাড়া করতে গিয়ে পেলেন না তাকে।

ফিরে বিছানায় টর্চ ফেনে বিশ্বেশ্বর চমকে উঠলেন, পাখ-
বালিশে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা গোঁজা!

পার্বতীকে উনি বললেন—কুঞ্জলালের ছেনে চিরঞ্জীলাল
আমার বংশলোপ করতে এসেছিলো। ভগবান রক্ষা করেছেন

আভিশ্যন্ত বংশ

কিন্তু বুঝতে পারছি, এখন থেকে কত সাবধান হ'তে হবে ?
খুন ক'রে যেত প্রদীপকে ও নিজের বুদ্ধি ক'রে স'রে না গেলে ।

সাবধান হওয়া যার জন্তে, সেই শুধু বুঝতে পারলো না
কেন এসব কাণ্ড ? তাকে খুন করবে লোকে ? কেন ? সে
ত কারুর কোনো ক্ষতি করেনি ! খুন করা মানে ত'মেরে
ফেলা ? তাকে কেন মারবে ? এ সম্বন্ধে বাবীর সঙ্গে
পরামর্শ করা উচিত । তার বুদ্ধি একটু যেন বেশী ।

সকালবেলা বাবী এসে সব কথা শুনে কেঁপে কেঁপে
অস্থির ।

বললে—আমারি ভুল হয়েছিল প্রদীপ, সে-ই যখন
হেখলুম, কেন চেষ্টায়ে লোক জড় করলুম না ! বুঝেছি, কেন
তোমাকে খুন করতে এসেছিল । তোমার দাছ যে ডাকাতির
সর্দার ছিলেন,—

ধেৎ—প্রদীপ বাধা দেয় । অবিশ্বাস্য কথা কেন সে
শুনবে ?

না, সত্যি, আমি বাবা কাকা সকলের মুখে শুনেছি ।
মিথো নয় এক ফোঁটাও ! ডাকাত থেকে পরে জমিদার
হয়েছেন । কুঞ্জলাল ব'লে ওঁর একটা সঙ্গী ছিল, উনি তাকে
ধরিয়ে দিতে তার ফাঁসী হয়ে যায় । তারি ছেলেপুলেরা
তোমায় মেরে ওঁকে শাস্তি দিতে চাইছে নিশ্চয় । তুমি ত'
বলছ—দাছ বলেছেন কুঞ্জলালের ছেলে চিরঞ্জীলাল এসেছিল ।

অভিযাত্রিক

প্রদীপ প্রতিবাদ করে—উনি মেরেছেন, ওঁকে মারবে।
আমায় মেরে তাদের কী লাভ ?

কী লাভ, বাবীও সেটা ভালো বুঝতে পারে না। বলতে পারে না। সত্যি ত', একজনের দোষে আর একজনকে মারা কেন ?

শুধু বলে—তুমি বাপু একটু সাবধানে থেকো। আমার আবার ভাবনা ঢুকে গেল মাথায়। এ আবার এক জ্বালা হ'ল !

প্রদীপকে ভাল লেগেছে নাবীর।

বিশ্বেশ্বর মনে করলেন—চিরঞ্জীলালকে ধরিয়ে দেবেন। কিন্তু ধরাবেন কি ক'রে ? সে ত' ফেরার। পুলিশই ত' তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার। কি ক'রে সে এসেছিল, কোথায় লুকিয়েছিল, প্রদীপের মুখে তার বিস্তৃত বিবরণ শুনে বললেন—মুখের গ্রাস ফস্কে গেল !

সেইদিনই প্রদীপের জান্নায়ে লোহার গরাদে বসলো। চারিধারে পাহারা রইলো। ঘরের মধ্যে পার্শ্বতী। ভঁসিয়ার পার্শ্বতী।

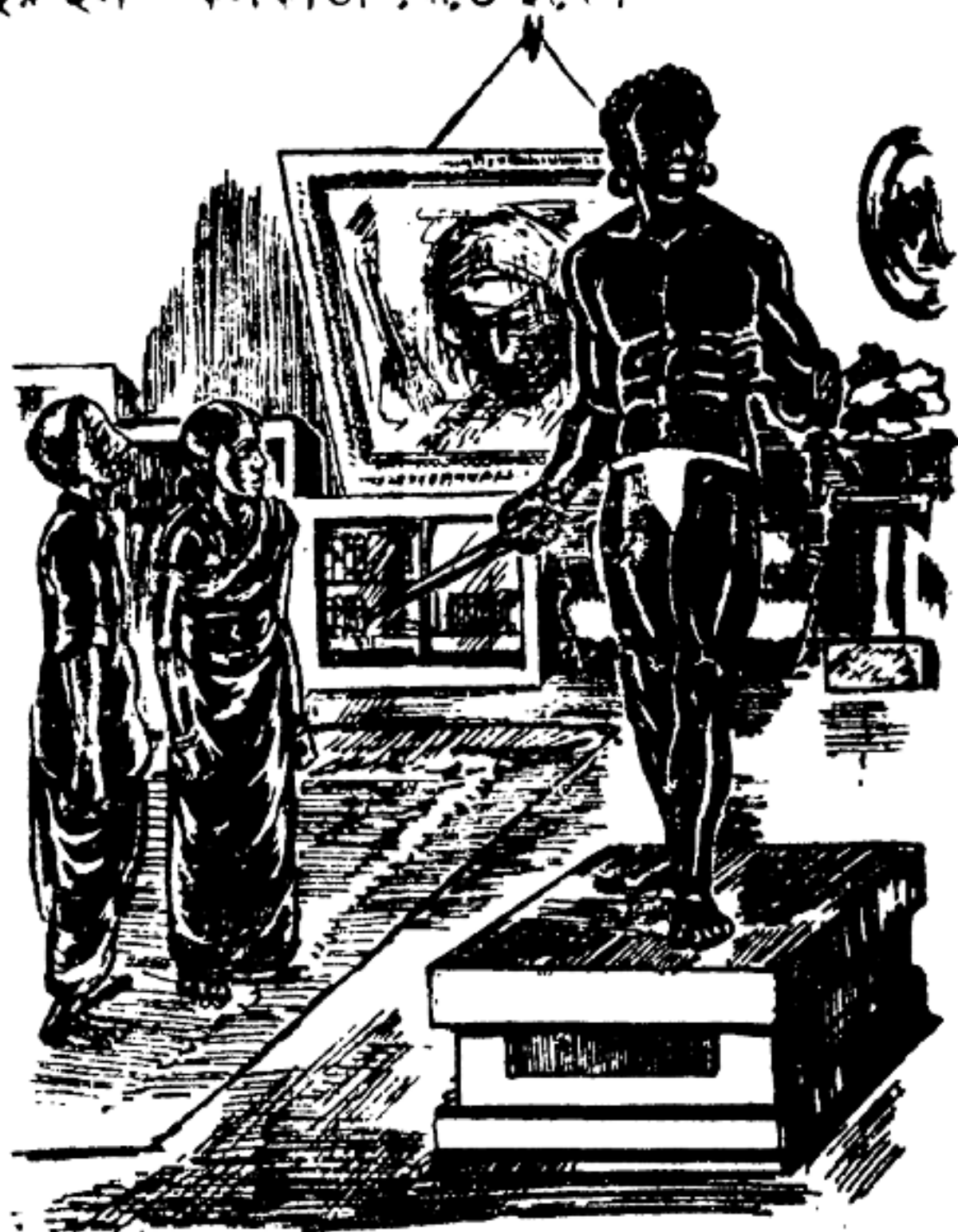
সন্ধ্যা থেকে সমস্ত গৃহকোণ তন্ন তন্ন ক'রে দেখে সদরের কোলাপ্সিবল্ গেট বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। কিন্তু তবু সে রাতে অজানা আশঙ্কায় কারুর ঘুম হল না—না প্রদীপের, না তার দাচর, না লোকজনের।

আজিও রক্ত

তার পরের রাতও এমনি ।

তারও পরের রাত ।

বিশ্বেশ্বর দেখলেন—এ রকম ক'রে ত শরীর খারাপ হয়ে
যাবে । একটা বিহিত করা দরকার । নায়েবের সঙ্গে পরামর্শ
ক'রে স্থির হল—কলকাতা যেতে হবে ।



বাবীর অন্তরাখা শুকিয়ে গেল (পৃ: ২৪)

প্রণবও বললে—সেই ভালো । এসব ব্যাপারে কলকাতা
শহর অনেকটা নিরাপদ । পল্লীগ্রামে কখন কি ঘটে বলা যায়

না। হয়ত একদিন ডাকাতই পড়লো। ডাকাতরা কী না পারে? কেটেকুটে রেখে গেলেও কিছু করবার নেই।

বিশ্বেশ্বর বললেন—না, এ বাড়ীতে কখনও ডাকাতি হবে না, নিশ্চিত থেকো। এক সর্দারের কাছে যারা লাঠিধরা শেখে, তারা সব গুরু-তাই। ডাকাতদেরও নীতি আছে। তবে পরের পুরুষ কী করে, বলা যায় না।

বিশ্বেশ্বর সম্বন্ধে কানাঘুসা প্রণবও শুনেছিল। তাই হঠাৎ ব'লে বসলো—যাই বলুন, ডাকাতি বড় ঘৃণ্য কাজ। যাক, এখন তাদের বিষদাত ভেঙে গেছে, আগের মতন যেখানে সেখানে আর ডাকাতি হ'তে পারে না।

হ'তে পারে না বলেই দেশের কল্যাণ গেছে। একদিন বাংলা দেশে একদল ডাকাতি করত, আর একদল তাদের রুখত, ছন্দেলেরই গায়ে শক্তি ছিল, মনে সাহস ছিল। আজ সব ভীকু দুর্বল হয়ে গেছে। আজ যারা ডাকাত, তারাও ভীতুর একশেষ, অভাবে প'ড়ে এগিয়ে আসে, আর হাতের হাতিয়ারের জোরে কাজ সাফ করে। তাদের ঠেকাবার লোক ত' নেই দেশে বলতে গেলে। ডাকাতের হুকুম শুনেই আজ লোকে ধমুধরু ক'রে কাঁপে, বাধা দেবে কি? তাও সব বাঙালী ডাকাত নয়। পাঞ্জাবী, মুসলমান, পেশোয়ারী।

ও প্রসঙ্গ আর বাড়তে না দিয়ে প্রণব যাবার জন্তে প্রস্তুত হল। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি,

আভিষেক রত্না

প্রদীপ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কপালে কার ঠাণ্ডা হাত ঠেকলো ।
চোখ মেলে দেখে, বাবী । কোমল কণ্ঠে সে বললে—তোমরা
নাকি চলে যাচ্ছ প্রদীপ ?

হ্যাঁ ভাই ! আবার ত আসব ।

স্নান হেসে বাবী বললে—কবে আসবে তার কিছুই ঠিক
নেই । তোমার সঙ্গে আর হয় ত আমার দেখা হবে না ।

তুমিও আমাদের সঙ্গে চলোনা ।—প্রদীপ প্রস্তাব ক'রে
বসলো ।

বাবী বললে—সে হ'লে ত বেশ হয়, কিন্তু—

দাঁড়াও দাড়কে বলি । বললে প্রদীপ উৎসাহে ।

দাড় রাজী হলেন না !—না, ও পরের মেয়ে আমি নিয়ে
যেতে পারব না । ওর বাপ মা ছাড়বে কেন ?

ইঠাৎ প্রদীপের মন কেমন ক'রে উঠলো । তার মনে হ'ল
বাবী না গেলে তার বিপদ অনেক । সত্যি, ও পরের মেয়ে,
তার প্রয়োজন ব'লেই ত আর যেতে পারে না ! কী জোর
আছে তার ওপর ? মুখ মলিন ক'রে বাবী চ'লে গেল । দেখে
গেল প্রদীপের ছ'চোখে জল । সে-ও বাড়ীতে গিয়ে খুব কাশা
জুড়ে দিলে । সকলে বলে—কী হয়েছে ?—না, প্রদীপ চ'লে
যাচ্ছে । যাচ্ছে ত যাচ্ছে, তোর কি ? এ কথা ব'লে কোনো
মীমাংসা হল না । শেষ অবধি প্রদীপের মোটর ওদের বাড়ীর
সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দেখে ও বিছানায় লুটিয়ে পড়লো ।

গোখেল রোডে ওদের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

প্রদীপ যখন জানলে—সেখান থেকে গড়ের মাঠ একেবারে কাছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেশী দূর নয়, কালীঘাটও মনে করলেই যাওয়া যেতে পারে, চিড়িয়াখানাও হেঁটে পৌঁছানো যায়, তখন তার মনে খানিকটা স্মৃতি হল।

তবু মোটরে ক'রে খানিকটা ঘুরে আসতে শহরে যখন আলো জলে উঠত, দোকানপাটের আলোর সারি রাজপথের দুধারে মালার মতন ছড়িয়ে যেত, তখন তার মনে পড়ত—অন্ধকার বাঁশবাগানের ওপারে কোনখানে এক বাড়ীতে বাবী ব'সে আছে একলাটি।

কলকাতায় কোন বিপদ ছিলনা। কিন্তু একদিন সকালবেলায় কী এক চিঠি এলো, দাছ প'ড়ে রেগে অস্থির। তার মাষ্টারমশাই বললেন, তার ন-কাকা আর নতুন কাকা যারা নাকি জুয়া খেলে, রেসু খেলে, কোথায় থাকে ঠিক নেই, চিঠি লিখে শাসিয়েছে অবিলম্বে বিশ হাজার টাকা না পেলে তার দাছকে খুন করতেও পিছ-পা হবে না। তার চেয়েও কঠিন শাস্তি তারা দিতে চায়, প্রদীপের মাথা ফাটাবে, ঐ নাকি সকলের চক্ষুশূল! চিরঞ্জীলাল তাদের দলে আছে।

ভয়ের চেয়ে প্রদীপের হাসি আসে। বাপ মাকে যে

আভিষেক রত্না

দেখলো না, ছোটবেলা থেকে যে স্নেহযত্নবঞ্চিত, ভবিষ্যতে কী বিষয় পাবে না পাবে, তার জন্তে এত লোক তাকে শেষ করতে চায়! শেষ অবধি নিজের কাকারা! তার চেয়ে দাছ কেন সমস্ত টাকাকড়ি বিলিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে কোনো কুঁড়ে ঘরে চ'লে যান্না! কী দরকার ছিল রোজ রোজ এই সব বিপদ ডেকে আন্বার?

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দাছর কাছে যেতে তিনি বললেন— আজ থেকে তুমি আর বাইরে বেরুবে না। রাতদিন বাড়ীতে থাকবে।

প্রদীপের চোখে জল এলো। সেইদিনই পড়ন্ত বেলায় গড়ের মাঠে সে ঘুরে এসেছে নরম সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে, মেমোরিয়ালের ধার দিয়ে। সেখানে রোজ রোজ যেতে তার ইচ্ছে করে, এখন থেকে আর যাওয়া হবে না! আরো এগিয়ে দেখেছে সিনেমাগুলির সামনে রঙীন আলো, উজ্জ্বল আলো রাতকে দিন করবার চেষ্টা।

এই গোখল রোডের পীচুটাল, নির্জন গলিপথে শহরের সে সব সৌন্দর্য্য এসে পড়ে না, আসে না সেই সব বিচিত্র লোকেরা কোনোদিন রাস্তা ভুলে।

গ্রামের প্রকাণ্ড বাড়ীতে সে যেমন বন্দী ছিল, এখানেও ত প্রায় তেমন।

কিন্তু বেশী কিছু বলতে পারলে না, বেশী বলা তার স্বভাব নয়।

অভিজ্ঞান শূন্য

বাড়ীর সামনে পাগড়ী ও পায়জামা-পরা কটা লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। ওপরের বারান্দার দিকে তারা কী দেখে ?

প্রদীপ হয়ত দাঁড়িয়ে আছে, একটা দাড়িওলা লোক তাকে দেখতে লাগলো না গিলতে লাগলো। প্রদীপ সরে না। শাস্তু চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।

একদিন ছপুরবেলা লোকটা বললে—খোকা টফি খাবে ? চকোলেট খাবে ? ত' এসো।

গম্ভীরভাবে প্রদীপ বললে—আমি ওসব খাই না।

লোকটা চ'লে গেল, সোনালী রূপালী রাংতা মোড়া জিনিসগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে ঝলঝলে পকেটে পুরে। প্রদীপ মনে মনে বললে—আমি জানি তোমার বদ্‌মায়েসী, নীচে যাই ঐ সব নিতে, আর তুমি আমাকে ক্যাক্ ক'রে ধরো !

কোথায় কি একটা অসুবিধা হচ্ছিল, দাছ একদিন বিকালে বললেন—আমরা এক জায়গায় যাব। কোথায় তা বলব না। লোকজন কেউ জানবে না। শুধু সঙ্গে যাবে প্রণববাবু আর পার্শ্বতী।

ট্রেনে চ'ড়ে প্রদীপ জানতে পারলে—ওরা দার্জিলিং মেনে উঠেছে, তাহ'লে যাচ্ছে দার্জিলিং।

বাবীটা কি বোকা, যদি আস্বার ব্যবস্থা কোনোরকমে করতে পারত, তাহলে এই সুযোগে দার্জিলিং দেখা হ'য়ে যেত।

আভিষ্যাস

প'ড়ে রইলো সেই গ্রামের অন্ধকারে । আর কি কখনো হবে ?
আর প্রদীপেরও কি একলা কিছু ভাল লাগবে ? দার্জিলিং
যতই না কেন সুন্দর হোক !

শিলিগুড়িতে ট্রেন থেকে নেবে দাছ একটা মোটর করলেন,
তখন সবে মাত্র ভোর হচ্ছে ।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে
উঁচু থেকে আরও উঁচুতে কী চমৎকার রাস্তা চলেছে ! খানিক
পরে ওরা যেন এলো পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশের রাজ্যে !
কোথায় কত নীচে নদী, গ্রাম, মাঠ ! মেঘ, কুয়াসা, জঙ্গল,
পাহাড় অদ্ভুত সব দৃশ্য একসঙ্গে ।

প্রদীপ শুন্লে, ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরের দিকে চেয়ে যে
পাহাড়ের মাথা দেখা যায় না, যার গায়ে ছোট ছোট সাদা
বাংলো, সে সব ছাড়িয়ে ওপাশে আরো উঁচুতে চলে যেতে
হবে ।

জঙ্গল আর নেই । শুধু হাল্কা মেঘ ভেসে আসছে, আর
শীত করছে । গরম জামা পরলো ও ।

প্রণব বললে—পিছন থেকে একটা মোটর যেন আমাদের
অনুসরণ করছে ।

বিশ্বেশ্বর বললেন—অনুসরণ কেন করবে ? আর একখানা
গাড়ী আসতে নেই ? এ পথে ত' কত গাড়ী যায় ।

কিন্তু দেখা গেল, গাড়ীখানার মতলব খারাপ, যেখানটা

আডিশ্যু বঙ্গ

গভীর খাদ, সেখানে পাশ থেকে এসে ধাক্কা মারতে চায়। যেন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাবার মতলব !

এ গাড়ীর ড্রাইভার চ'টে গেল। নেবে বল্লে—কেয়া মতলব হায় তুমারা ? চলা যাও আগে।

ও গাড়ীর ড্রাইভার বল্লে, নিকাল যানেকো রাস্তা কাঁহা ?

আচ্ছা ঔর আগে যাঁহা চওড়াসা সড়ক্ মিলেগা, হুঁয়া তুমকো জায়গা কর্ দেগা। আভি চালাও সামারকে।

গাড়ীতে বোরখা পরা মেয়েরা ছিল।

পাগলা ঝোরার কাছাকাছি এসে—পথটা যেখানে ভারী বিপজ্জনক—লাগালে চাকায় ধাক্কা ! একটা প্রবল ঝাঁকুনির সঙ্গে গভীর অন্ধকার।

বিশেষর ভরা রিভলবার নিয়ে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন।

বলা নেই কওয়া নেই, তিনটে টায়ার ফট্ ফট্ করে ফাটলেন।

তার পর বল্লেন, থাকো এখানে সারারাত হিমে প'ড়ে। চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি ?

বোরখা পরা তিনটি মেয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে যেন আসনের নীচে লুকোতে চায়।

বিশেষরের সন্দেহ হ'ল, ওরা মেয়ে নয়। কিন্তু পরীক্ষা উ করা যায় না।

আশিষ্য বৃক্ষ

ডাইভারকে বললেন, কী ভেবেছ তুমি ? মানুষ খুন করবে ?

সে যেন কত ভয় পেয়ে গিয়ে বললে—ছজুর আচনক্ হো গিয়া । অ্যাক্সিডেন্ট এইসাই হোতে হেঁ ।

আচ্ছা লম্বুর দেও তুমারা । ব'লে নম্বর নিলেন । তারপর নিজের গাড়ীতে চ'ড়ে বসলেন । গাড়ী চললো । প্রদীপ ততক্ষণে সহজ হ'য়ে উঠেছে । তার দাছ থাকতে আর ভয় কি ? ভরসা পেলেই মানুষের ভয় যায় ।

পাগলামোরা ঝর্ণা কোন্ উঁচু থেকে ঝ'রে পড়ছে দেখতেই পাওয়া যায় না । আর কত নীচে যে যাচ্ছে তারও কোনো হিসাব নেই । ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে বেশ লাগে ।

কিন্তু সময় ত ওদের বেশী নষ্ট করা চলবে না । অনেক রকমের বিপদ আছে ।

অনেক উঁচুতে এসে এক জায়গায় দাছ বললেন—গাড়ীটা রাখো ত, দূরবীণ ক'সে দেখি, ও ব্যাটারদের ব্যাপার কি ।

যা ভেবেছি তাই, ব্যাপার সুবিধার নয় । গাড়ীখানাকে ঠেলেঠেলে রাস্তার এক পাশে রেখে ওরা পাহাড়ের গা দিয়ে যে পাক্‌দণ্ডী রাস্তা আছে, সেই সোজা পথে আস্তে আস্তে উঠছে গাছ ধ'রে ধ'রে । মতলব কি হে মাষ্টার ?

প্রণব বললে, সম্ভবতঃ ওরা ওপরের রাস্তায় আমাদের জন্তে অপেক্ষা করবে । যতক্ষণে ঘূর্ পথে ঘুরতে ঘুরতে আমরা

অভিশপ্ত বৃক্ষ

ওপরের কার্টরোডে গিয়ে হাজির হব, ততক্ষণে অন্য কোন মতলব বার ক'রে ওরা আমাদের গাড়ী রুখবে। দিন ত দূরবীণটা। ও কি? বোরখা পরা মেয়ে ত কেউ নেই, সব যে পুরুষ মানুষ! গাড়ীটার ড্রাইভারটা শুধু রয়েছে, আর ত কাউকে দেখছি না।

একশো মাইল জুড়ে যেখানে শুধু পাহাড় আর জঙ্গলের রাজ্য এক দিকের আকাশ আড়াল ক'রে, অন্য দিকে দূর সমতলভূমি সবুজ গাল্চের মতন প'ড়ে আছে তার নদী অরণ্য গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র নিয়ে—শুধু ডালিয়া ফুলের বর্ণশ্রুমা, গিরি-প্রসূনের গন্ধ, পাখীর কণ্ঠ আর ঝর্ণার গান, সেখানে সেই অসীম নির্জনতার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের হীনতম কাজে বনলক্ষ্মীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার কথা।

কিন্তু তা হল না। তার বদলে প্রদীপদের ড্রাইভার ভয় পেয়ে গেল। সে আর এগোতে চাইলো না। যা হয় দিয়ে তাকে মিটিয়ে দিলেই সে ফিরে যাবে বললে।

দাছ কি খানিকটা চিন্তা করলেন। তার পর বললেন—গাড়ী ঘোরাও।

নীচে থেকে একখানা ট্রেন উঠে আসছে। পাগলাঝোরার কাছে নেমে তাইতে উনি সকলকে নিয়ে উঠলেন। ট্রেনের সঙ্গে চালাকি করা অত সহজ নয়।

অভিশপ্ত বৃক্ষ

হলুদ রং এর বাড়ী । নাম বুঝি তাই হলুদে কুঠি ।

তবু প্রাসাদের সমস্তটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না । গাভ-পালায় আড়াল পড়ে । বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া গাছ, ওক আছে, দেবদারু আছে, ইউক্যালিপটাস্ আছে, আছে আম জাম কাঁঠালের বন ।

ফটক পার হ'য়ে শামুকের সাদা খোলা দিয়ে বাঁধানো, ফিকে লাল পুরনো রাস্তাটা দিয়ে চ'লে যাও, ছপাশে ঠাণ্ডা গাছের ছায়ায় শুকনো পাতার রাশ, অনেকখানি চ'লে পাবে দেউড়ি । ভিতরে ঢুকেই প্রকাণ্ড উঠোন, চক্‌মিলানো । বাড়ীর মধ্যে খালি সিঁড়ি, ঘরের পর ঘর, ছাদের পর ছাদ, বারান্দার পর বারান্দা :

সব শূন্য, সব খাঁ খাঁ ।

বারবাড়ীর বৈঠকখানায় তাল দেওয়া । নেই সেখানে পুরুষ কণ্ঠের অটুহাসি । অন্তরের রান্নাঘর ঝুলে ভরা । নেই সেখানে নারীহস্তের কঙ্কননিকণ ।

ଆଭିଜାତୁ ବ୍ୟକ୍ତି

এত বড় পুরী লোকজনে যা একদিন গম্‌গম্‌ করত, আজ যেন অপরাহ্নের স্নান আলোতে থম্‌থম্‌ করতে থাকে। বাইরে দরোয়ানদের অলস গলার গান, গাছে পাখীদের কচিৎক্লান্ত শুর সেই একটানা স্তব্ধতাকে আরো গম্ভীর আরো অসহ্য ক'রে তোলে।

এখনো সব ঘর আমাদের দেখা হয়নি। বাকী আছে
অনেক অনেক দিক।

তবু বেলা থাকতে থাকতে লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকে পড়ি।

এত বড় 'হলে' এত বইয়ের লাইব্রেরী, এমন কমই দেখেছ।

বইয়ের আলমারী প্রায় কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে, চারিধারের
দেয়াল ভ'রে আলমারীর পর আলমারী ।

সেখানেও বই ধরেনি। ব্যাক্ শেল্ফ টেবল্ বোঝাই ক'রে শেষে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, লাল, নীল, সবুজ, কালো মলাটের অসংখ্য অণ্ডন্তি বই।

ঘরের সমস্ত শাসীগুলো লাগানো। রঙীন ~~কুচ~~ ^{কুচ, শুধু} সভান
নয়, তাতে রং বেরংএর কত না ছবি আঁকা—কত সমুদ্রের, কত
অরণ্যের দৃশ্য, কত বনের বাঘ, কত দীঘির সারস, কত ছেলে-
মেয়ের ছুটোছুটি।

তার ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের যে পড়ন্ত রোদ এসে এখানে
এখানে পড়েছে, তারও আভা যেন মায়াময় । চোখে যেন
ঘোর লাগে ।

মাডিশাঙ্গ বংশ

অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে তবে নজরে পড়ে, একটি বৃদ্ধ ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসে অথও মনোযোগ দিয়ে যেন কী পড়ছেন।

খানিক পরে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। রোগা, অতিরিক্ত লম্বা লোকটি, পাকা আমের মতন টকটকে রং, দীর্ঘশ্রু একেবারে সাদা হ'য়ে যায়নি, কাঁচাপাকায় হরিহরমূর্তি, মাথার চুল পাংলা হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল। মর্মভেদী সে দৃষ্টি।

বইয়ের মাঝখান দিয়ে লম্বা ঘরটার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত তিনি পায়চারী করলেন অনেকবার।

শেষটা আরাম কেশরায় শুয়ে পড়তে হাত চাপা দিয়ে কী ভাবতে লাগলেন।

বাড়ীটার কিছু তফাৎ দিয়ে গঙ্গা ব'য়ে গেছে।

শ্রোতের টানে সাদা ও কমলা রংএর পাল তুলে দিয়ে নোকো চলেছে।

নদী যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে সারি সারি কলের চিম্নী। ঠিক ওপারে শিবের দ্বাদশ মন্দির, কার যেন বাগান-বাড়ীর ঘাট। ওপারের সমস্ত সবুজ গাছগুলোর মাথায় সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছটা লাগছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ঈশান কোণের মেঘ আকাশে মাথা তুলে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো।

আভিষেক বক্ষ

মাঝিরা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো ঘাটে তরী লাগাবার জন্যে ।
এলো, এলো কালবৈশাখী ।

বন্ধ দরজার কাছে এসে ডাকলেন—পার্বতী ।
ভূতা পার্বতীচরণ বোকের ওপর বসেছিল—সাদা দিলে—
ভজুর !

ঝড় আসছে নাকি রে ? ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে !

বারান্দায় বেরিয়ে এসে সে বললে—আসছে ।

তাহ'লে আজ সে আসবে ।

বন্ধের স্বরে উত্তেজনা ।

সার্শীটা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে তারপর নিজেই
বললেন—ঝড় আসছে । বছরের প্রথম ঝড় । আজ সে
নিশ্চয়ই আসবে । বন্ধ ক'রে দে ফটক । লছমন সিং !

নীচে থেকে দরোয়ান হাঁকলো—ছজোর !

বন্ কর্ দেও বাহীরওয়ালা কেওয়াড়ি !

খানিক পরেই বললেন—নেহি, রহনে দেও । আনে দেও
উস্কো । বন্ কর্নেনেসে আউরভি মুশ্কিল । আনে দেও, যো
হোয়, সো হোয় !

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল ঝড়, বাগানের গাছে
গাছে মুহূ মর্ম্মরধ্বনি শেষে একটানা শৌ শৌ শব্দে রূপান্তরিত
হ'য়ে গেল, ধুলোতে বালিতে ঠাণ্ডা বৃষ্টির গুঁড়োতে আলো
অন্ধকারের মধ্যে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য গ্রীষ্মদক্ষ

আডিশ্যু বৃক্ষ

পৃথিবীর ভালোই লাগবার কথা—কিন্তু জীর্ণ বৃক্ষের চোখে
যেন আশঙ্কার বণা এলো ।

ঝড় তখনো চলেছে ।

ঠাণ্ডা—ঝড়ের মাঝেই তীক্ষ্ণ তীব্র আওয়াজ—ফিরিয়ে দাও,
ফিরিয়ে দাও ।

চমকে উঠে বৃক্ষ গিয়ে তাঁর চেয়ারে বসলেন কান দুটো
চেপে । সদর থেকে আর্তনাদ মহলের পর মহল পার হ'য়ে
অন্দরের দিকে প্রসারিত হল—ফিরিয়ে দাও ! ফিরিয়ে দাও !

বৃক্ষের কণ্ঠ ভয়ে করুণ ও ক্লান্ত—দোব দোব—যা যা তুই
যা, সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠ—না, না এখনি ফিরিয়ে দাও, আজই
ফিরিয়ে দাও—বীভৎস বিস্ত্রী কলহের মতন শোনাতে লাগলো ।

সেই ফিকে অন্ধকারে একটি ফরসা ছেলে ছুটে এসে প্রশ্ন
করলে—কে ও দাছ, কী ফিরিয়ে নিতে চায় ?

বৃক্ষ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—তুই যা যা প্রদীপ, এখান থেকে
যা ।—তুমি চ'লে যাও । তুমি চ'লে যাও, আমি ফিরিয়ে দোব
যখন বলেছি, দোবই ।

কবে দেবে ? আর কবে দেবে ?

বাইরে ঝড়ের আওয়াজ তখন ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে
উঠেছে । গাছের ডালপালা ভেঙে ভেঙে পড়ছে । এক একটা
দম্কা হাওয়ায় খড়খড়ি শাসী বন্বন্ব ক'রে উঠছে । পুরোন
বাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত যেন কেঁপে উঠছে ।

আভিষেক রত্ন

সেই ঝড়ের মধ্যে সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই রহস্যঘনমূর্তি
তার অদ্ভুত আবেদন নিয়ে মিলিয়ে গেল ।

ক্রমে ঝড় থেমে গেল । আকাশ পরিষ্কার হ'ল ।

পড়ার ঘরে একলা ছোট ছেলে প্রদীপের দুর্বল মনে সেই
আশ্চর্য্য প্রার্থনার কথাই বারবার আঘাত ক'রে ফিরতে
লাগলো । কেন ও বললে—‘ফিরিয়ে দাও’ ‘ফিরিয়ে দাও’ ?

সামনে আরো অন্ধকার রাত । তাকে একেবারে একলাটি
শুতে হবে । তারায় ভরা নীল আকাশের ভয়দূরকরা চাঁদের
আলো আজ নেই ।

মাষ্টারমশায়ের আসূতে দেবী হচ্ছে । পড়ায় তার মন
বসছে না ।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ নিয়ে সে
বসেছে । এই বই প'ড়ে নাকি তার দাছও বাংলা শিখেছিলেন ।
প্রথমে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় পড়েছিলেন ।

যাই হোক, সে অনেকটা এগিয়ে এসেছে । এতদিন
পড়ছিল—ক আর র—কর ; ঘ আর র—ঘর ; এখন দেখছে
বেশ মিল আছে, যদিও ফাঁক ফাঁক ক'রে লেখা—

কর	ঘর	ধর	কর
পর	মল	ধর	ফল
যত	কয়	তত	নয়
গত	হয়	কত	সয়

ঠিক কবিতার মতন ।

আভিষ্যন্ত বৃক্ষ

তারপর— সরস দল পনস ফল

সরল নল তরল জল—শেষ ক'রে এখন

তাকে পড়তে হবে—

ক-এ আকার কা আর ল—কাল ।

ক-এ আকার কা আর ক—কাক ।

নিজে নিজেই বিস্তর পরিশ্রম ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে প'ড়ে
দেখে ওমা, একি ? এও যে কবিতা !—

কাল কাক ভাল নাক ।

কাটা কাণ ফাটা শাণ ॥

শিকি চাই টিকি নাউ ।

মণিহারা ফণীপারা ॥—কী আশ্চর্য্য !

আরো আশ্চর্য্য তার লাগে এ কথা ভাবতে, এখন ত' এত
কষ্ট ক'রে বানান ক'রে ঘেমে উঠে একটি একটি ক'রে সে কথা
শিখছে ! পরে এমন দিন আসতে পারে যে বই হাতে করলেই
সে তর্তুর্ ক'রে গল্প পড়তে পারবে, মাষ্টারমশায়ের মতন !

চাই কি এরকম একটা বই সে লিখেও ফেলতে পারে !

না, অতদূর ভরসা করবার তার সাহস সেই ।

এই সময়ে মাষ্টারমশাই এসে গেলেন । যাক্ ভয় খানিকটা
দূর হ'ল ।

একজন মাষ্টারমশাই পাশে থাকা যে কী ভাল, বলা
যায় না ।

আভিষেক

সে বলতে পারে, অণু ছেলেদের কাছে, যে তার একজন মাষ্টারমশাই আছেন—যদিও অণু ছেলেদের সঙ্গে কতটুকু বা তার দেখা হয় ? কচিং কখনো কেউ যদি বাগানে ঢুকে পড়ে, তবেই ।

মাষ্টারমশাই কিন্তু সকলের থাকে না । প্রদীপ সে খবর নিয়েছে । আর থাকলেও, এত ভালো মাষ্টারমশাই খুব কম লোকেরই থাকে, প্রদীপ ভালো রকমই জানে, কেউ না বললেও ।

তিনি মোটে মারেন না । যে মাষ্টারমশাইরা মারে, তাদের লোকে বলে মাষ্টার । মশাই কিছুতেই বলেনা ।

প্রদীপের মাষ্টারমশাইয়ের নাম প্রণববাবু । ভয়ানক শক্ত বানান করা । তার নিজের নামের মতন । এখনো র-ফলায় সে পৌঁছয়নি, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারে, অণু ছেলেদের মতন পোদীপ বলে না । একেবারে পদবী পর্য্যন্ত বলে, আমার নাম—প্রদীপ মল্লিক ।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করে যখন—তোমার বাবার নাম কি ? বলতে পারে না । ওটা তাকে শেখানো হয়নি । তারা তাদের বাবার নাম বলে । আর হাসে ।

মাষ্টারমশাইকে আজকে প্রশ্ন করে—আপনি জানেন আমার বাবার নাম কি ? মার নাম কি ?

আমি কি ক'রে জানবো বলো ? গিয়ে জেনে নিয়ো

আড্ডিগু বৃক্ষ

তোমার দাত্তর কাছ থেকে । আরো আগে জানা উচিত ছিল ।

একদিন জিগেসু করেছিলাম দাত্তকে । দাত্তর মুখ অমনি গম্ভীর হ'য়ে উঠলো । বল্লেন, তোমার দরকার কি ?

আবার যেন বাইরে ঝড়ের আওয়াজ আসছে । মনে হয় প্রদীপের—আবার যদি সেই রকম কথা বলে এসে সেই অদ্ভুত মূর্তিটা ! আবার যদি দাত্ত চোঁচামেচি করেন ? ঘোর অন্ধকার বাইরে । ঘোর অন্ধকার দালানে । এখন ওসব না হওয়াই ভালো । কিন্তু কান পাতলে কি শোনা যায় না অনেক অ-নে-ক দূরে 'ফিরিয়ে দাও' ?—

এই বংশের একটু ইতিহাস এইবার জানা দরকার ।

প্রদীপের প্রপিতামহের নাম ছিল হারাণ । ও নামে কিন্তু তিনি পরিচিত ছিলেন না, লোকে তাঁকে জানত হারু ডাকাত ব'লে । ইচ্ছামতীর চরে, ধলেশ্বরীর ধারে, আড়িয়ল খাঁর পারে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় হারু ডাকাতের দল-বল দূরের যাত্রীদের পথরোধ ক'রে যথাসম্ভব হরণ করত । এই জলদস্যুর দলকে মহাজনরা ভারী ভয় করত ।

কিন্তু হারু ডাকাতের দলের একটু বিশেষত্ব ছিল এই যে

আভিষ্কার

হল্‌দে রঙের গাড়ীখানি নীচের দিকে নেমে গেল।

দাছ সমানে চলন্ত ট্রেন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন।

ওরা বোধ হয় গাড়ীখানাকে ফিরে যেতে দেখেছিল।

ট্রেন তখন চলেছে ওপরে, মোটরখানা নীচে যাচ্ছে।
কখনো দেখা যায়, কখনো আড়াল পড়ে। হঠাৎ স্পষ্ট দেখা
গেল ওপর থেকে একখানা পাথর ওরা গাড়িয়ে ফেলে দিলে
গাড়ীখানার মাথায়, একটু শব্দ পর্য্যন্ত এতদূর এলো না, তার-
পরেই ট্রেন আর একটা পাহাড়ের উল্টো দিকে চ'লে গেল,
কিছু দেখা গেল না। কুয়াসা আরো ঘন হ'য়ে উঠলো।
ঠাণ্ডাটা আরো বেশী।

ডারজিলিং যখন পৌঁছলো তখনো বারোটা বেলায় রোদ্দুর
দেখে মনে হচ্ছিল যেন সকাল সাতটা। হ্যাপি ভ্যালি ভিউ—
বাড়ীখানা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায়, তিনদিকে কোনো পথ
নেই। একদিকে ব্রীজ বন্ধ ক'রে দিলে আসা কঠিন! দুর্গ
বললেই হয়।

সেই বাড়ীর দোতলার ঘরের জানলা থেকে সাদা
কাঞ্চনজঙ্ঘা বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রদীপের অপূর্ব লাগলো
আর বাবীর জন্তে মন কেমন করতে লাগলো নতুন ক'রে।

ডারজিলিং কথাটা উচ্চারণ ক'রে তার মনে একটু
আভিজাত্য ভাব জাগলো।

কোথায় গেছলে? না ডারজিলিং, বলবার মতন কথা।

আড়িৎ রং

যে-সে যখন তখন কিন্তু ডারজিলিং আসতে পারে না ! মাষ্টার মশাই নিজে বলেছেন । তিনিই ত এতখানি বয়সে এই প্রথম এলেন ! বলা যেতে পারে এটা রঙের দেশ । নয়ত কি ? যেখানে প্রত্যেক বাড়ীটি রঙীন, ফুলগুলি রঙীন, রাস্তা রঙীন, মানুষগুলো এবং তাদের পোষাকগুলো রঙীন, আকাশ রঙীন. পাহাড় রঙীন, সে যদি রঙের দেশ না হয় ত আর রঙের দেশ কোথায় ? বর্ম্মায় নাকি আরো রং আছে, জাপানে নাকি তার চেয়ে বেশী রং । কিন্তু এই বা কে পায় ! গ্রামে তারা কি দেখে ? খালি সবুজ । কলকাতায় ? রং-ই নেই ! আকাশটা শ্লেটপাথর, রাস্তা ধুলোয় ধূসর । তাই ব'লে বলেছে না যে তাদের গ্রামের চেয়ে খারাপ । গ্রামের চেয়ে ভালো স্মৃষ্কার করতে হবে বৈকি ! তার নাম কলকাতার শহর ! পুরোণ হাওড়া ব্রীজ ভেঙে যখন নতুন হাওড়া ব্রীজ হবে তখন একটা দেখবার জিনিস নিশ্চয়ই হবে । তখন হয় ত পুরোণটাকে কেউ পুঁছবেও না । কিন্তু সেটাই কি কম আশ্চর্য্য ? ছবিতে দেখা ছিল, এবার সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, বাবী যা দেখেনি ।

রাত্রে মনে হল এখানেও সেই গুণ্ডাগুলো ধাওয়া করবে না কি ?

মাষ্টারমশাই বলেছেন, অত সহজ নয় ! এ বাবা ডারজিলিং । বেশী চালাকী করতে এসো ত নিজেরাই মুশ্কিলে পড়বে ! আর তাদের বাড়ীতে যে ভুটিয়া দরোয়ান আছে, সে কুকুরী নিয়ে

আজিলাপ্ত বংশ

ফেরে, কথায় কথায় পেটে গুঁজে দেয়। তারা হল পাহাড়ী, অসভ্য গোঁয়ার বটে, কিন্তু কুকুরের মতন বিশ্বাসী।

তার ওপর দাছ কোথা থেকে এনেছেন এক বিরাট কুকুর গ্রেট ডেন, বাঘের মতন চেহারা। বাঘের মতন ডাক। চেনবাঁধা অবস্থায় তার রোখ দেখলে লোকে সাত হাত তকাত্তে যায়। কিন্তু প্রদীপের কাছে? ও যেন একটি ইঁদুর! ‘বুলেট’ ব’লে ডাকলেই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে! দাছ বলেন—শানাই ওর নাম। বাঙালী নাম বুঝি কুকুরের হয়? ও হ’ল বুলেট!

দার্জিলিংএর রোদ সত্যি যেন সোনালী, সোনার মতনই ঝকঝকে। গাছের পাতাগুলি ঠিক যেন নীল আর সবুজ মখমল। ফগুও ঠিক বাংলাদেশের প্রান্তরের কুয়াসা নয়, পাতলা ঝকঝকে রূপোর পাত। উপত্যকায় ধবধবে সাদা মেঘ ঘুমিয়ে আছে, যেন রাশি রাশি বকের পালক! পাহাড়গুলি যেন ধোয়া মোছা, বেগুনী রং করা। তার ওপরে হাজারো রঙের বিলাতী ধরণের কাঠের বাড়ীগুলি থাকে থাকে পাহাড়ের কোলে কোলে সাজানো—দূর থেকে দেখো—অবিকল জলছবি। প্রদীপের ভীষণ ভালো লাগে দার্জিলিংকে। শহর চ’লে গেছে কত ওপরে—আর কত নীচে কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে—অত ঘুরে ঘুরে দেখা তার মতন ছোট ছেলের পক্ষে অসম্ভব! এইখান থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এই অবজার্ভেটরী হিলের তলা থেকে, এই রেলিংএর ধার থেকে।

অভিশপ্ত বৃক্ষ

তার মতন ছোট ছেলের পক্ষে দামী আলষ্টারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নেপোলিয়নের মতন এমনি দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই যথেষ্ট কায়দা আছে ! আর বেশী সখ ভালো নয় ।

ঐত' কত লম্বা লম্বা মেয়েরা লাল ওভারকোট আর কুচ্‌কুচে কালো আলষ্টার পরা হিল্ট'চু সাদা জুতো খট্‌খট্‌ ক'রে পাশ দিয়ে চ'লে গেল বলতে বলতে 'চমৎকার মুখখানা বাচ্ছাটার, লাভলি!' তার মানে কি ? তাকে ভালো দেখাচ্ছে ।

একটা মেম এসে তাকে আদর করলো, টফি দিয়ে, জড়িয়ে ধ'রে । সাহেবটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলো সঙ্গের বুল্ডগটার মতন । ওরা ত জানে না তাকে খুন করা হবে !

প্রণববাবুর হাত ধ'রে বার্লিহিল পর্য্যন্ত সে গেছলো আজই সকালে । অনেক লোকজন পথে যাওয়া আসা করছে । তার ভয় করেনি । দরোয়ান ছিল সবসময় ।

মাষ্টারমশাই তাকে বললেন—এরকম ক'রে থাকা তোমার চলবে না এই অমামুষের মতন ।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ছোট্ট ফেন্ট্‌ হাট্টা নামিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল, বুঝতে পারেনি কথাটা ।

মাষ্টারমশাই বুঝিয়ে দিলেন—গায় জোর করতে হবে, মনে জোর আনতে হবে । জিউজিৎসুর প্যাচ্‌ শিখতে হবে, কুস্তির প্যাচ্‌ও । আক্রান্ত হ'লে কি ক'রে আত্মরক্ষা করতে হবে

আভিমান

তাও তোমার জানা চাই। তোমার দাও তোমায় ভুল পথে
চালাচ্ছেন। তুলোয় ঢাকা আঙুরের মতন রেখে দিলে তুমি
চির অসহায় থেকে যাবে।

দার্জিলিংএর রোদে বার্চহিলের মাথায় কথাগুলো যেন
দৈববাণীর মত শোনায়।

প্রদীপের মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে।

মাষ্টারমশাই ব'লে চলেন—তোমাকে আমি অভিমুখ্য ক'রে
তুল'ব—মৃত্যুকে যে ভয় করে না। বাংলাদেশের সকল ছেলের
যা হওয়া উচিত।

নামতে নামতে তিনি বলেন—অথচ হয়নি। ছেলে এদেশে
মানুষ হয় না।

সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে ধূতিপরা প্যান্টপরা কত ছেলে
পাহাড় থেকে নেমে গেল, প্রদীপের চেয়ে অনেক
বড়।

মাষ্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে প্রদীপ বললে—ওরা ?

ওরা কেউ মানুষ হয়নি।—গম্ভীরমুখে তিনি বললেন।

কেন বললেন—প্রদীপ বুঝতে পারলো না। কত ইংরিজি
কথা ওরা বলছে, হোটেলের কথা, হাসির কথা, মজার কথা—
ওরা কেউ মানুষ হয়নি ? আশ্চর্য্য !

সেদিন দাওর সঙ্গে মাষ্টারমশাইয়ের কী ভীষণ তর্ক—
টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে কথা, যেন রাগারাগি ব্যাপার।

আভিষেক রত্ন

মাষ্টারমশাই বলছেন—আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমি ওকে কি তৈরী করি দেখুন। পাঁচটা বছর আমায় সময় দিন।

দাছ বললেন—তোমার প্ল্যান কি বলো।

আমি ওকে মির্জাপুরে নিয়ে যাব, সেখানে বড় বড় ওস্তাদের কাছে রেখে ওর শরীর শক্ত ক'রে তুলব।

বলোনা গুণ্ডার কাছে গুণ্ডামি শেখাবে!

তাই যদি বলেন, 'তাই। ফুলবাবু হ'য়ে ওঠা চলবে না। অজীর্ণ শরীর জীর্ণ, হাওয়া খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া ছেলে নিজের পক্ষেই একটা ভারস্বরূপ। আমাকে যখন গার্জিয়ান টিউটর করেছেন, ছেড়ে দিন আমার হাতে।

আমি ত জমিদারী ছেড়ে অতদিন বাইরে থাকতে পারব না। দাছ প্রতিবাদ করেন।

থাকতে হবে না আপনাকে। আমি সব ভার নিলাম। আপনি কেবল টাকা পাঠিয়ে খালাস।

আমাকে ভাবতে সময় দাও।

প্রদীপের মন খারাপ হ'য়ে যায়। এমন সুন্দর দার্জিলিং ছেড়ে কোথায় নোংরা মির্জাপুর! এত রং এত ফুল এত আলো এত হাওয়া—ভালো ক'রে সব ভোগ করা হ'ল না, এখনি যেতে হবে ছেড়ে দিয়ে?

সে বলে মাষ্টারমশাই, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না

আজিগু বংশ

দার্জিলিং ছেড়ে। কী সুন্দর ফুল এখানে, কী চমৎকার পাখী—

পাথরের মতন মুখ কঠিন ক'রে মাষ্টারমশাই জবাব দেন—
জীবনটা ফুলের গন্ধ আর পাখীর গান দিয়ে ভরা নয় প্রদীপ,
বিশেষ ক'রে তোমার জীবন। একথা বোঝবার সময় এসেছে।
শক্ত কাজ নীরস পথ তোমার জন্তে। আমি শুধু তোমায়
পড়াতে আসিনি, গড়াতে এসেছি। আমার অপূর্ণ কামনা
তোমাকে দিয়ে সার্থক ক'রে তুলব। ষাটালীর ছেলের যা
হওয়া উচিত, কিন্তু হয়নি, আমি তোমাকে তাই ক'রে আনব।

কিছুই বুঝতে পারে না প্রদীপ। তার ভয় করে।
চোখে জল আসে। মন কেমন করে। মাষ্টারমশাইকে ভালো
লাগে না।

বিকেলবেলা দাছ বল্লেন—প্রণববাবু, আপনি যে ওদের
চর নন, তার কি প্রমাণ? ওদের কাছে টাকা খেয়ে যে
আমার বংশের শেষ সন্তেটিকে নিভিয়ে দিতে যাচ্ছেন না,
কী ক'রে বুঝব?

প্রণববাবু বল্লেন—ছেড়ে দিলাম চাকরী আজই। এই
মুহুর্তে।

—ছেড়ে দেবেন এই ঘাসিক ছশো টাকা আর, বিনামূল্যে
খাওয়া পরা?

—হ্যাঁ! ধুলোর মতন পরিত্যাগ করলাম।

অভিষেক

—তাহ'লে ত আর এক রাতও আপনার এখানে থাকা হয় না।

—সন্ধ্যের ট্রেণেই আমি চললাম। প্রদীপ যে আমার কী, আপনি জানেননা, তাই এত বড় আঘাতটা দিতে পারলেন! এর পরে আর কোনো কথা চলে না।

ব'লে তিনি স্মৃটকেশ গোছাতে বসলেন।

দাছ ওঘরে গিয়ে বললেন—আচ্ছা রগচটা লোক! দিই এক মাসের মাইনে বেশী।

এখানে প্রদীপের কি করা উচিত, সে ভেবেই পেলেন না।

মাষ্টারমশাই না দার্জিলিং, কে বেশী প্রিয়?

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সে ভালো ক'রে ভাবতে লাগলো।

মেঘ আর ফগ্, ডালিয়া ফুল আর পাইন গাছ, রঙীন নগরী আর হিমালয় পাহাড় চিরদিন থাকবে—অন্য এক সময়ে এসে ভালো ক'রে দেখা যেতে পারে, কিন্তু প্রণব বাবুর মতন মাষ্টারমশাই একেবারে চ'লে গেলে তার চেয়ে আকশোষের কী আছে?—মন কেমন করতে করতে এই কথাই প্রদীপের মনে হল।

সে দাছকে গিয়ে বললে—দাছ আমি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যাব।

বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে দাছ বললেন—কোথায় যাবে?

আভিষেক

যেখানে উনি নিয়ে যাবেন ।

দাছ কোনো কথা বললেন না । অনেকক্ষণ উত্তরের জন্তে অপেক্ষা করেও তাঁকে সাড়া দিতে না দেখে প্রদীপের আর তাড়া দিতে ভরসা হ'ল না, সে নিঃশব্দে বাইরে এসে দাঁড়ালো ।

মাষ্টার মশাইয়ের স্টুকেস গোছানো শেষ হয়েছে, প্রদীপ কাছে গিয়ে বললে, আমাকে নিয়ে চলুন ।

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন—সে হয় না প্রদীপ । পৃথিবীতে তোমার দাছর চেয়ে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই জানবে । ভুল পথে চললেও তিনি তোমার শুভ কামনা করেন সব সময়ে । তাঁর বিনা অনুমতিতে কিছু হ'তে পারে না । আমি চ'লে যাচ্ছি তাঁর ওপর রাগ ক'রে নয়, তোমার ভালো কিছু এ অবস্থায় করতে পারব না ব'লে । সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে তোমার কল্যাণ করবার ক্ষমতা আমার নেই ।

বিদায় নেবার সময়ে প্রদীপের মাথায় হাত দিয়ে তিনি ব'লে গেলেন—আমার পরে যে শিক্ষকই তোমার আশ্রন, তাঁকে আমার মতনই ভক্তি করবে । আর আমাকে মনে রাখার কোনো দরকার নেই, আমার কথাগুলো মনে রেখে কাজ করলেই হবে ।

শহরের আলো জ্বলে উঠেছে, হিম ও কুয়াসায় ঢাকা পথে প্রণব বাবু নেবে গেলেন !

ট্রেন ছাড়বার আর দেরী নেই—দাছ ঘড়ি দেখে বললেন ।

প্রদীপ্ত বৃক্ষ

হঠাৎ পাহাড়ী দরোয়ানের হাতে একখানি চিঠি লিখে
র'লে দিলেন ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যেতে।

প্রদীপ তখন শুতে যাচ্ছে, দেখে অবাক হল মাষ্টারমশাই
ফিরে এসেছেন। দাঁড় মত বদলেছে। বললেন—চিঠিতে
ক্ষমা প্রার্থনা আশা করি মঞ্জুর করেছ মাষ্টার। প্রদীপকে ছেড়ে
দিলাম তোমার হাতে। ভেবে ভেবে আমি আর পারি না।

পরদিন দিনের সূর্য্য পশ্চিমে চ'লে পড়বার আগে
শিলিগুড়ির প্রান্তরে ওরা নেমে এলো। তারপর উত্তরে এবং
পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণে, তারপর পশ্চিমে কত গ্রাম কত
প্রান্তর দেখে গজায় প্রীতির ক'রে ওপারে অগ্নি রেললাইনে চ'ড়ে
গুরু শিষ্য আর পার্বতী পৌঁছে গেল বিক্র্যাচল ষ্টেশনে।

বিক্র্যাচল পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে জাহ্নবীর গেরুয়া
রঙের বিস্তৃত বালুচরে ঝিলিক্ মারা রোদ প্রদীপের বিষণ্ণ মন
প্রসন্ন ক'রে তুললো।

বিক্র্যাচল—মাইলের পর মাইল ছড়ানো। মাইলের পর
মাইল সমতল ভূমি তার শিখরে। অরণ্যের পর অরণ্য, গুহার
পর গুহা, ঝর্ণার পর ঝর্ণা এবং গ্রামের পর গ্রাম।

সেখানে সে ঘোড়ায় চড়া শেখে, কুস্তি শেখে মির্জাপুরী
ওস্তাদের কাছে। সাঁতার শেখে বিক্রেশ্বরীর মন্দিরের ঘাটে।
পড়া তৈরী করে ছবেলা নিয়মিত।

আভিষেক রত্না

বিক্র্যাচলের লোকেরা কেউ ওকে জমিদারের নাতি ব'লে চেনে না, জানে গরীবের ছেলে ব'লে। এমন কি পোষাক আর ভাষায় বাঙালী ব'লে চেনা যায় না, মনে হয় হিন্দুস্থানী। সে ছাতু খায়, চানা খায়, বাদাম খায়, কাঁচা ভুট্টা খায়, দাঁত দিয়ে আখ ছাড়িয়ে খায়।

সে গাছে চড়ে, লাঠি ঘোরায়ে, বন্দুক ছোঁড়ে।

সূর্য্য ওঠার অনেক আগে তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। অন্ধকারের বুক থেকে আকাশ ও মাটির ছবি ধীরে ধীরে আলোতে কেমন ক'রে ফুটে ওঠে, স্বপনের রাজ্য থেকে জাগরণের দেশে আসা যায়, তার অনুভূতিতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

মীচে দূরে গঙ্গা ধু ধু বালির চড়ায় যেন লক্ষ্মীর আলপনা এঁকে দিয়েছে। বিক্র্যাচলের পাহাড় থেকে পাহাড়ে সেঠ গঙ্গার হাওয়া ব'য়ে যায়।

যেদিন মেঘ ক'রে ওঠে, কনকনে বাতাস চলে, ঝরঝর বৃষ্টি নামে, গাছগুলির রং নানা রকমের দেখায়, সেদিন শুষ্ক কঠিন দেশে যেন বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। সেদিন ঝর্ণাগুলো ফুলে ফোঁপে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন গঙ্গার সমস্ত বালুচর ডুবে যায় রাঙা জলে।

এক বছর বাদে প্রদীপকে আর চেনা যায় না। শরীর তার শক্ত হ'য়ে গেছে, মনে এসেছে সাহস। ছপূরের চড়চড়ে রোদ

মন্দির

মাথায় নিয়ে, কিশ্বা বৃষ্টিঝরা অন্ধকার দিনে, সাপে ভরা রাতের
রাস্তায় মাইল পার হয়ে যেতে পারে সে অনায়াসে।

একদিন—তখনো উষার আলো জাগেনি ভালো ক'রে,
বিক্র্যাচলের মাথায় সমতল প্রান্তরে সেই অস্পষ্ট আলোয় পাংলা
অন্ধকারে প্রদীপ বেরিয়ে পড়েছে একলা! খানিকটা গিয়ে
দেখলে আশ্চর্য্য জিনিস—দলে দলে হরিণ চরছে, নিশ্চিত
নির্ভয়ে। কোনো কোনোটার শিং ছোট গাছের শাখা প্রশাখার
মতন নীচে-নেমে-যাওয়া-আকাশের গায়ে ফুটেছে, কোনো
কোনোটার বাদামী রং অল্প আলোয় চক্ চক্ করছে। যেই না
ওর সাড়া পাওয়া, অমনি দলের প্রথমটা দিয়েছে লাফ, আর সঙ্গে
সঙ্গে সমস্ত হরিণের পাল যেন সোণালী তরঙ্গের মতন ছুঁলে
উঠে সবুজের সমুদ্রে ডবে গেল।

চলতে চলতে সে পেল একটা সিঁড়ি, নেমে গেছে পাহাড়ের
গা দিয়ে পাতালপুরীর দিকে। অনেক নীচে ঘন অরণ্যের
দিকে। অনেক নীচে ঘন অরণ্যের মাথা, সেইদিকে চেয়ে সে
নেমে চলল। শুনেছে, কোথায় ডাকাতে কালী আছে, হাঁ-করা
ভীষণ মুখ, সেই মুখের গহ্বরে একশোটা পাঁঠার রক্ত ঢেলে
দিলে নিঃশেষে তলিয়ে যায়। ঐ দিকে ঐ গহন বনের মধ্যে,
নির্জন নিরালায়। আড়াই শো সিঁড়ি পার হ'য়েও মন্দিরের
কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আরো আরো নীচে নামতে
হবে। ভোরের পাখী তখন ঘুম ভেঙ্গে একে একে ডেকে উঠছে।

আড়িচাষ বৃক্ষ

ক্রমশঃ অরণ্যের মাথা দেখা গেল, দীর্ঘ বনস্পতির চূড়াগুলি, ক্রমশঃ আম জাম কাঁঠালের সারি। ক্রমশঃ লতাপাতায় আচ্ছন্ন অন্ধকার বনভূমির মধ্যে যেন প্রদীপ ডুবে গেল। ভিজে স্যাৎসেঁতে মাটি, পাতা থেকে তখনো শিশির ঝরে পড়ছে, তখনো আকাশের আলো সেখানে এসে পৌঁছয়নি। কালীবাড়ীতে তখনো প্রদীপ জ্বলছে।

ভিতরে সে প্রবেশ করলো। অন্ধকারের মধ্যে মূর্তি, যেমন শুনেছে, সেই রকমই বটে। প্রণাম করে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাইরে অঙ্গনে এক ভীষণ হাড়িকাঠ। দূর অতীতে গতন অরণ্যের মধ্যে কত নরবলি হ'য়ে গেছে ওখানে, গেছে কত অসহায় দুর্বলদের প্রাণ নিষ্ঠুর মানুষের হাতে! মৃত্যু যে জল্লাদদেরও ছেড়ে দেয়নি, বাতাসে যেন তাদের নৃশংসতার স্মৃতি ভেসে আসে।

পথ আরো আরো নীচে নেমে গেছে। বিস্ফা পাহাড়ের মানুষদেশ সেখানটা। ওপরে চূড়ায় রাঙা রোদ এখানে গাছের মাথাগুলোকে রঙীন করে তুলেছে। নীচে আলো হয়ত ছপুরের মাঝামাঝি আসবে।

জায়গাটা প্রদীপের ভালো লাগলো। বিস্ফা পাহাড়ের নীচে নীচে কত জায়গায় এমনি কত রহস্য লুকানো আছে। খানিকটা গিয়ে একটা পরিষ্কার বাঁধানো কুয়া, বসলো তার ধারে। সেখানটা একটু ফাঁকা।

আডিশ্যু বংশ

একে একে লোকে জল নিতে আসে। কেউ স্নান করে, কেউ মুখ ধোয়। হঠাৎ একটা ছোকরা গোছের লোক জিগোস্ করলে—আপ্ কাঁহা রহেতে হেঁ ?

—পাহাড় পর।

—কাঁহা মুলুক আপ্ কা ?

বলে প্রদীপ—গাজীপুর।

—আপ্ গাজীপুর ওয়ালা? কোন্ গাঁও ?

—চিতুপুর। তুম্ কাঁহা রহতে হো ?

—হামারা বালিয়া জিলা ভাই, বনারস্ সে আগে। আপ ত মেরা দেশোয়ালি ভইল্।

বেশী কথা না বাড়িয়ে প্রদীপ ওপাশে উঠে গেল। অনর্গল মিছে কথাগুলো বলেই বা কী ক'রে ?

লোকটা আর একটা লোকের কাছে স'রে গিয়ে বললে—
ই কহতে হেঁ গাজীপুর রহনেওয়ালা, হাম্ শোচতে হেঁ এইসা কভি নেই হো সক্তে হায়। উ হায় বাংগালী।

সে লোকটা জবাব দিলে—বাংগালী কভি এইসা পায়জামা পিন্তে হেঁ ? কেয়া কহতে হো ভাই ? যো হোয়, সো হোয়, হামারা ক্যা ?

প্রদীপ ওপরে উঠে এলো।

মাষ্টারমশাই বললে—আদা ছোলা খাওনি, মেহনৎ করোনি ডন বৈঠক্ দিয়ে ! কোথায় ছিলে ?

আভিষ্কার

যা যা হয়েছে, প্রদীপ বললে।

প্রণব বললে—আমার সঙ্গে ছাড়া কোথাও বেরিয়ে না।
সময় সময় মিথ্যে কথা বলতে হয়, কিন্তু কাঁচা কথায় বিপদ
বাড়ে। কে কি মতলবে তোমায় কোন্ কথা জিগ্যেস করবে,
সব ধরতে পারা তোমার বয়সে সম্ভব নয়। চলো আজ পাখী
শিকারে যাই।



দেখলেন তাঁক ছোরা গোলা (পৃ: ২৯)

দীর্ঘকাল নাটিকে না দেখে বিশ্বেশ্বরের মন হুহু করে

চিঠিতে খবর পান, মনিঅর্ডারে টাকা পাঠান, কিন্তু একবার দেখতে যাবার নাম করলে প্রণব নিষেধ করে—এখনো নয়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে তিনি বেরোলেন। মাদ্রাসা, রামেশ্বর, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, কুন্তুকোনম্, কণ্ঠাকুমারী ঘুরেও মন স্থির হ'লনা। হয় কখনো? প্রদীপের কাছে যার মনটি প'ড়ে আছে?

একবছর কেটে গেছে, আরো একবছর কাট'লো।

একদিন তিনি কোনো নিষেধ না শুনে উত্তর ভারতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। এলেন কাশীতে। সেখানে দুদিনও থাকতে পারলেন না। একদিন বাসে চ'ড়ে নামলেন মির্জাপুরের ওপারে।

অপরাহ্নের আলো তখন স্নান হ'য়ে আসছে। বুনবুন-ক'রে এক একা এসে নীচে দাঁড়ালো, ডাকবাংলো থেকে দেখতে পেয়ে প্রদীপ বললে—কে এলো মাষ্টার মশাই।

প্রণব বললে, কত ভাড়াটে আছে, তাদেরই হয়ত কেউ। চলো আমরা বাড়ী ফিরি।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলনা, দাছ এসে হাজির।

দাছ বলেন—দাছ, প্রদীপ বলে—দাছ। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে, সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য খানিকক্ষণ।

প্রদীপের চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখে তিনি খুশী হলেন ভারী। কল্পনাই করতে পারেন নি। পাথরের মতন

আড়িন্দ্র বসু

শব্দ হয়ে গেছে ছেলে। সে কথা মুখে কিন্তু উচ্চারণ করতে পারলেন না, পাছে নজর লেগে যায়।

প্রণব বললে—কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না আপনি। ছবছর আমরা এখানে আছি, কেউ জানতে পারেনি আমাদের পরিচয়। আপনি এসেই বোধহয় সর্বনাশ হ'ল।

—কিসের সর্বনাশ ?

আরেকটা এক্কার বুনবুন-আওয়াজ শুনিযে প্রণব বললে—
বুঝতে পারলেন ? ঐ ? এলো আপনার সঙ্গে সঙ্গে চর।

সাবধানে থাকো তোমরা।

সাবধান অবশ্য ওদের হ'তেই হ'ল। বিস্ফোচনের মাথায় অনেক অপরিচিত মুখ এদিকে ওদিকে দেখা গেল সকাল থেকেই।

সেদিন আবার ওদের টাণ্ডা ফল্‌স্‌ যাবার কথা ছিল। ভয়ে ত যাওয়া বন্ধ করা যায় না ? ছুথানা টাঙ্গা ছপুরবেলা আনানো হ'ল।

একটাতে দাছ আর পার্বতী, আরেকটাতে গুরু শিষ্য।
'টাঁড়োয়া দরী' দেখতে ওরা চললো, যেমন সকলে যায়।

আখড়ার কাছে এসে একবার ওস্তাদজীকে খবর দেওয়া হল, তিনি মুকুবিয়ানা ক'রে বললেন—কেয়া ? ডর লাগ্তা হায় ? ডরনেকো কাম নেহি।

নিজ্জন দীর্ঘপথ বিস্ফাগিরি শ্রেণীর গায়ে গায়ে। ঝর্ণা যেখানটা ঝ'রে পড়ছে, সেখানটা আরো উপভোগ করবার

আডিকার বংশ

জিনিস। ঘুরে ফিরে খানিকটা দেখা হ'ল। জলখাবার আনা হয়েছিল, ব'সে ওরা খাচ্ছে, এমন সময় একখানা ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো।

দাছ চেয়ে দেখলেন।

হাতের লাঠির দিকে চেয়ে প্রণব বললে—আসতে দিন যে আসুক। কী প্রদীপ? ভয় করছে?

প্রদীপ বললে, লাঠি আমারো আছে।

খাবার শেষ হবার আগেই কিন্তু লাঠিয়ালরা ওদের ঘিরলো, মোটর থেকে যারা নেমেছিলেন। এদেরও লাঠি ঘুরে উঠলো।

চক্ষের নিমেষে। বিদ্যুৎগতিতে।

প্রণব দুজনকে কাৎ করলে।

ছেলেমানুষ প্রদীপও একজনকে।

চতুর্থ জন প্রণবকে ঠেকিয়ে দাঁড়ালো, তিনজনে মিলে প্রদীপকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলেছে। ফিরে দেখবার আগে মোটরে ঠাট দিলে। মরিয়া হ'য়ে প্রণব তার বিপক্ষের বুকে প্রচণ্ড ঘা বসাল।

ওরা সাতজন এসেছিল।

মোটর তখন ধুলোর আড়ালে মিলিয়ে গেছে। যে ছোটো মাথা ফেটে পড়েছে সে ছোটো মুসলমান। প্রদীপ যাকে জখম করেছে, সে হিন্দুস্থানী। শেষ যেটাকে মাটিতে ফেলেছে, সেটার জাত বোঝা মুশ্কিল চেহারা দেখে। কোনটারই কথা

আভিষেক

বলবার ক্ষমতা নেই, কাৎরাচ্ছে করুণভাবে। একটা জল চাইলে।

প্রণব তখন ছুটে বেরিয়ে পড়লো হতভম্ব বিশ্বেশ্বরবাবুকে সঙ্গে টেনে সাদা ঘোড়ার টাঙ্গায়।

কথা বলবার মতন অবস্থা নয়, তবু বললে, আপনার জন্মেই এই সর্বনাশটা ঘটলো, কেন আপনি এলেন? আমরা বেশ ছিলাম।

বিশ্বেশ্বরবাবু কথা বললেন না। তাঁর বলবার কিছু নেই তাঁর মনে হল তিনিই যেন ওর ছুগ্রহ। জীবনে যত পাপ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হল না?

মোটরে ওঠবার সময়ে শেষ চীৎকার শুনেছেন তিনি প্রদীপের—দাছ ও দাছ!

অসহায় দাছ কিছুই করতে পারলেন না। বন্দুকটা সঙ্গে থাকলে এখনো সোজা হ'য়ে ছুঁড়তে পারতেন, তাতে টায়ারটা অন্ততঃ ফাটত।

তার বন্দুক ত তুলে রাখবার জন্মে হয়নি, এমনি চোর ডাকাতদের শেষ করবার জন্মেই সরকার থেকে দেওয়া হয়। গভর্ণমেন্টের দায় কমে, ঝগাট কমে।

আফশোস ক'রে লাভ নেই এখন। দীর্ঘ ধূলিধূসর বন্ধিম পথ দিক্চক্রবাল পর্য্যন্ত শূন্য পড়ে আছে, মোটর দূরের কথা, জনমানবের দেখা নেই। বিস্ময় পর্বতমালা গ্রহরীর মতন নিশ্চল হ'য়ে আছে।

আভিষ্কার

দূরে দেখা গেল, একটা গ্রামের ধারে মোটরটা দাঁড়িয়েছিল, তখনি ধূলোর ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন ক'রে মিলিয়ে গেল।

কাছাকাছি এসে প্রণব দেখলে ওস্তাদজীর লোকেরা তৈরী ছিল, পথের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে মোটর আটকেছিল, কিন্তু এরা মাত্র দুজন, তাদের কাছে পারলোনা। গ্রামের লোক ডাক্তে ডাক্তে পালালো।

ওস্তাদজীও মির্জাপুরের পথে দাঁড়িয়েছিলেন, খুব ছুঃখ করলেন, আফশোষ করলেন কেন দল ভারী ক'রে লোক পাঠাননি। এত সাহস হবে তাদের, তিনি ধারণাই করতে পারেননি। তাঁর এলাকা থেকে তাঁর সাক্ষরদকে নিয়ে যাবে! যাইহোক, তিনি ব্যবস্থা করছেন। দিকে দিকে চর পাঠাচ্ছেন। কিন্তু টাকার দরকার।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, টাকার জন্তে ভাববেন না।

কিন্তু টাকার জন্তে ভাবতে হ'ল।

পরদিন একখানা খাম এলো ডাকে—এলাহাবাদ ফোর্টের মধ্যে যেখানে অফিসবট আছে সেখানে কোনো লোককে আশি হাজার টাকা নগদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনদিন ভাববার সময় দেওয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, আশি হাজার টাকা বড় বেশী হ'য়ে গেল না? এখন কোথায় বা পাই অত টাকা এখানে?

প্রণব বললে, তার চেয়ে বলুন কেনই বা দিতে যাব ওদের?

আভিষ্যন্ত বংশ

কিছু করতে হবে না। আমি একলাই গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করব শুধু হাতে।

শুধু হাতে? পুনশ্চ ব'লে তলায় কি লিখেছে দেখোনি? 'টাকা না আনিলে কিম্বা পুলিশে খবর দিলে প্রদীপেরই বিপদ জানিবেন।'

ওতে ভয় খাবার কিছু নেই। আমি আজই এলাহাবাদ



একখানা পাথর ওরা গড়িয়ে ফেলে দিলে (পৃ: ৪২)

চল্লুম

প্রয়াগ ঘাট। যমুনার কূল থেকে পরে নৌকো ছাড়ছে যাত্রী নিয়ে। প্রণবও উঠে বসলো, ছ' পয়সা দিলে সঙ্গম পর্যন্ত যাওয়া আসার দরুণ। গঙ্গার সাদা জল যেখানে যমুনার কালো জলের সঙ্গে মিশেও মিশতে পারছেনা, সেইখানে নৌকো থেকে নেমে জলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে প্রথমটা প্রণবের একটু ভয় হ'ল, ডুব-জল নয়ত? না, দেখে একটি ছোট ছেলে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

স্নান ক'রে এক ঘটি জল নিয়ে সে লাল কেল্লার দরজায় এসে দাঁড়ালো।

অক্ষয়বট দেখতে দলে দলে লোক চলেছে।

অন্ধকার ছোট ঘরের মধ্যে রূপো-বাঁধানো-গুঁড়ি ছোট একটি বটের চারা ওপরে রোডের দিকে শাখা বিস্তার করতে চাইছে। সেখানে ভিড় কম ছিলনা। প্রণব অপেক্ষা করতে লাগলো।

নেহাৎ ক্ষীণকায় একটি লোক কাছে এসে জিগ্যেস করলে—প্রণববাবু, টাকা এনেছেন?

অত টাকা একসঙ্গে আনা যায়? অর্ধেক এনেছি। বাইরে পুঁটলীগুলো রেখে আসতে হল, গোরা সিপাহীর হাতে দিয়ে এসেছি।

কি, আমাকে বন্দী করতে চান নাকি? মনে রাখবেন, যে মুহূর্তে আমায় ধরিয়ে দেবেন, সেই মুহূর্তেই প্রদীপের

প্রাচীন বৃত্ত

বিপদ ।

কোথায় আছে, তোমাকে বস্ত্রণা দিয়ে সে খবরটা আদায় করতে পারব ত ?

খবর আদায় ক'রে কোনো লাভ হবে না । গিয়ে দেখবেন হয়ত তাকে হত্যা করা হয়েছে । বুঝতেই পারছেন, যারা নিয়ে গেছে, তারা শুধু টাকাই চায়, দয়ামায়া ব'লে তাদের মনে কিছু নেই !

চলো ফোট থেকে বেরোনো যাক ।

গেট থেকে একটা পুটলী হাতে নিয়ে বেরোবার সময় প্রণব বললে, যে টাকা আছে এতে, এখানে নেবে ?

এখানে কি নেওয়া যায় ? চারদিকে সেপাইশাস্ত্রী ? চলুন ঐ নদীর দিকে নির্জন জায়গায় । অর্ধেক টাকা কিন্তু চলবে না । আমি নিতে পারব না ।

বালির চরে তারা গিয়ে দাঁড়ালো, ধারে কাছে কোথাও লোক নেই, দূরে দূরে ছ'একজন যাচ্ছে ।

প্রণব দেখলে, লোকটার মুখ রুদ্ধ কঠিন, নিষ্ঠুর তার দৃষ্টি । তবু বললে, ছেলেটাকে বাঁচানোর সম্বন্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো না ?

না, তা'হলে আমার বিপদ বাড়ে । আর বিশ্বাস ? কাকে করবেন আপনি ! জানেন, ওস্তাদজী পর্যন্ত টাকা খেয়ে আপনাদের বিপক্ষে গেছে ?

তা কি সম্ভব ?

টাকায় সব সম্ভব । আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি টাকাই আনেননি । ভালো করলেন না । আর দুদিন দেখে ওরা চ'লে যাবে অনেক দূরে, আবু পাহাড়, কিম্বা আসাম । তখন কোনো সন্ধানই পাবেন না । এই ব'লে গেলাম ।

দ্রুতপদে সে চ'লে গেল ।

পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য জিনিস ঘটে, তার মধ্যে একটি প্রদীপ আজ প্রত্যক্ষ করলো ।

যে বাড়ীতে ওকে তিন তলায় মুখ বেঁধে বন্দী ক'রে রেখেছিল, তার জান্না থেকে দেখলে সামনের বাড়ীতে বাবী— তার ছেলেবেলার বন্ধু বাবী, সিঁথেয় সিঁদুর, দিব্যি বোটি !

চোঁচিয়ে একবার বাবীকে ডাক্তে পারলে হয়, কিন্তু মুখ বাঁধা, আর বাবীও সিঁড়ির রেলিং ধ'রে নেমে যাচ্ছে ।

বাবী এসেছিল তার বন্ধু শীলার বাড়ী । রাস্তায় তার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, গিয়ে উঠলো । তার স্বশুর কমলবাবু এলাহাবাদের সবচেয়ে বড় উকীল, আর স্বামী তপন পুলিশের সাবইন্স্পেক্টর ।

শুধু এখানে এসে নয়, অনেকদিন থেকেই বাবীর প্রদীপের কথা মনে পড়ে, খবর না পেয়ে মন কেমন করে । কিন্তু উপায় নেই খবর নেবার, যে বুড়ো দাছ ! সে নাকি কাউকে কিছু বলবে ?

প্রদীপ

ইচ্ছে ছিল তার প্রদীপের কাছে দার্জিলিংএর গল্প শুন্বে—
এখানে যাওয়া পর্য্যন্ত তার জানা ছিল। ইচ্ছে ছিল তার,
প্রদীপকে এলাহাবাদের কথা শোনাবে, কদিনের অভিজ্ঞতায়
যা জেনেছে।

তাই যখন গঙ্গায়মুনাসঙ্গমের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা শুকনো
হাওয়া পিচ্ঢ়ালা পথের ওপর এসে পড়ছে ঝাউগাছের পাতা-
গুলোকে কাঁপিয়ে, তখন ব্রাউন রংএর কারে আরাম ক'রে
ব'সে অনেক দিনের পুরোধ বন্ধুকে মনে করা ভালোই লাগ-
বার কথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস—কোথায় কে
চ'লে যায়!

ছোটমেয়ের মনে এই করুণ আর্তনাদ, এই গভীর তত্ত্বকথা,
বড় মেয়েদের চেয়ে যে কিছু কম ক'রে বাজে তা নয়! বরঞ্চ
ছোটমেয়েদের চোখের পাতা বড় মেয়েদের চেয়ে বেশী ক'রে
ভিজে ওঠে আরো সহজেই!

চেয়ারে মুখ ঘ'সে ঘ'সে অনেকক্ষণ পরে মুখের বাঁধন
প্রদীপ যখন আলগা করলো, তখন বাবী তার বাড়ীতে পৌছে
গেছে। গিয়ে বিকেলবেলার স্নান সেরে চায়ের টেবিলে
বসবার আয়োজন করছে।

১ তবু প্রদীপ জান্নার কাছে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকলো—
বাবী! বাবী!

কোথায় বা বাবী? সে বাড়ীতে ছুটি মেয়ে থাকে শীলা

আর বুলা তাদের বাবা আর মার সঙ্গে। সকলেই গেছে লক্ষ্মীএ বেড়াতে, বাবীও এসে শূণ্য বাড়ী দেখে ফিরে গেল।

প্রদীপের হাত পা তখনো বাঁধা। তিন চার বার ডেকে যখন কোনো সাড়া পেলেনা, আর বুঝলে বাড়ীটা খালি, তখন সে হাল ছেড়ে দিলে।

তুদিন ধরে তার শরীরের ওপর দিয়ে ত কম ধস্তাধস্তি যায়নি! জখম হয়েছে, জখম করেছে!

সে প্রদীপ আর নেই। সেই ভয়ে মুষ্ড়ে পড়বার ছেলে! যতই না বিপদ ঘটুক, মাথা স্থির রাখতে সে খুব পারে, এখন যে তার গায়ে জোর এসে গেছে! গায়ের জোরেই ত' মনের জোর। আর মনের জোর থাকলে গায়ের জোরের অভাবই হয় না। প্রদীপ আজ মরীয়া।

তবু যতই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে লাগলো, ততই যেন তার মনে নামলো ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া।

অন্ধকারের মধ্যেই চিরঞ্জীলাল এলো তার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে। বলে গেল তাকে আবুপাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী ক'রে রাখা হবে। তার দাছ যদি আশি হাজার টাকা না দেন, ত না থাইয়ে শুকিয়ে তাকে মারা হবে।

কি ভাগ্যি, অন্ধকারে লক্ষ্য করলোনা প্রদীপের মুখ খোলা। প্রদীপও সেই ভয়ে কোনো জবাব দিলেনা, নইলে জবাব দেবার জন্তে তার মুখ যাকে বলে নিস্পিস্ করছিল। বলতে

আভিষেক

ইচ্ছে হচ্ছিল—টাকা দেবে না আরো কিছু !

কিন্তু খানিক পরে খাবার নিয়ে এলো যে লোকটা—দুষ্মন
গোছের লোকটা আলো নিয়ে—সে ওর মুখের দিকে চেয়ে
বললে—মুখের বাঁধন খুলে গেছে ? তা যাক্ গে । ধারে
কাছে কোথাও বাড়ী নেই, একখানি যা আছে, তাতে লোক
নেই । চেষ্টায়ে গলা ফাটালেও কোনো আশা নেই ।

খাবার আর কি ? একবাটি দুধ আর সন্দেশ ।



লাঠিয়ালরা ওদের ঘিরলো (পৃ: ৫৮)

আড়িচাণ্ড বংশ

বল্লে—আমি ধরছি, খেয়ে ফ্যাল।

প্রদীপ বল্লে—আমি খাচ্ছি, দিয়ে ফ্যাল। বিষটিস্
মিশোশ্শনিত ?

বিষ দুদিন বাদে মেশাব।

দুদিন বাদে আর সময় পাবি কি ? তখন আমিই তোদেব
কাঁসীকাঠে চড়াব।

বলিস্ কিরে স্মাঙাৎ ? ব'লে লোকটা চতুষ্পাটি দাঁত বার
ক'রে হা হা ক'রে হাসতে লাগলো।

রাতটা যে কী কষ্টে কাটলো, বলবার নয়। প্রদীপের
কেবলি মনে হচ্ছিল, চরম দুঃখের রাত্রির পরে সুখের প্রভাত
আসে—প্রণববাবুর কাছে শুনেছে যে কথা।

তার মন যেন গান গেয়ে উঠছিল—

দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে

তোমায় নাহি ডরিব হে।

ভোর তখনো হয়নি—রাত্রি শেষের প্রহর। হঠাৎ পাশের
বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠলো, ফিরেছে ওরা লঙ্কো থেকে।

সিঁড়িতে লোকজনের আনাগোণার শব্দ, জিনিসপত্র এখানে
ওখানে রাখার আওয়াজ।

ক্রমশঃ তিন তলায় প্রায় ওর ঘরের সাম্নাসাম্নি নারী-
কণ্ঠের কলশব্দ।

আভিষেক বক্ষ

আকাশে তখনো শুকতারা জ্বলছে।

প্রদীপ ডাকলো—বাবী!

শীলা বললে বুলাকে—কে যেন বাবীকে ডাকলো! পাশের বাড়ীতে কেউ বাবী আছে নাকি? বাবী নাম কি এত সাধারণ হ'য়ে গেছে? বাবী ত জানি একজন।

আমি সেই বাবীকে ডাকছি। বললে প্রদীপ।

বারান্দায় মুখ বার ক'রে শীলা বললে—কে আপনি?

আমি প্রদীপ, বাবীকে ডেকে দিন্।

বাবী ত' এ বাড়ীতে থাকে না!

যেখানে থাকে, খবর দিন্। বলুন প্রদীপ ডাকাতের হাতে পড়েছে।

ডাকাত? ও বাড়ীতে ডাকাত কোথায় এলো? ওটা ত' আলিমের বাড়ী। লোকটা অবশ্য খুব পাজী। কিন্তু ওখানে আপনি এলেন কি ক'রে?

অত কথা বলবার আমার সময় নেই। যে পাহারা দিচ্ছে, এখনো তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ জেগে উঠলে মুশ্কিল। আপনি শুধু বাবীকে খবর দিন্। সেই আমায় বাঁচাতে পারে। ফোন্ আছে ত' আপনাদের বাড়ীতে?

তা আছে। কিন্তু এই ভোররাত্রে ফোনে বাবীকে ডাকব? আলো হ'তে দিন্।

আলো হ'তে দিলে দেরী হ'য়ে যাবে।

স্বাভাবিক বৃত্তি

আমার বাবাকে জানাই ?

কোনো লাভ নেই ।

বাবী ছেলেমানুষ, পরের ঘরের বো ।

হোক্ গে, সেই পারবে শুধু আমাকে বাঁচাতে, আর কেউ না । তাকেই খবর দিন ।

কি বলব ?

বলুন, তোমার প্রদীপ বিপদে পড়েছে ।

এই বললেই হবে ?

এই বললেই হবে ।

কত যে ছেলেমানুষ প্রদীপ এই কথাতেই বোঝা গেল । পৃথিবীতে প্রদীপরা বিপদে পড়ে, কিন্তু বাবীরা সব সময়ে এসে পড়তে পারে না, যতই কেন না অনেক দিনের ভাব থাক ! বাবীরা ত' প্রদীপদের মতন স্বাধীন নয় । তা হোক্, কিন্তু বিপদে প'ড়ে প্রদীপের বাবী ছাড়া আর কোন কথা মনে পড়লো না ।

শীলারা অত ছেলেমানুষ নয় । তাদের বাবাকে সব কথা বললে আগে । তিনি লোকজন নিয়ে গিয়ে দেখলেন, সদর দরজায় তালা আঁটা । অথচ তিনতলায় লোক রয়েছে । আলিমের বাড়ী জাল জুয়াচুরীর জগ্গে কুখ্যাত । এটা আগে শরৎ সরকারের ছিল । সে তার বড় ভাজকে ঠকিয়ে এটি আত্মসাৎ করে । তারপরে বিপদে প'ড়ে বেচে দেয় আলিমকে,

প্রাচীন বঙ্গ

হিন্দু মুসলমান মাড়োয়ারী বারেন্দ্র রাঢ়ী কয়েকটি বদ্‌মাইস্ লোক মাঝে মাঝে এখানে এসে নানারকম ব্যবসা চালায়—জাল নোট থেকে জাল দলিল তৈরী পর্য্যন্ত। ছ একটা দল ধরা পড়েছে। আজ আবার কী নতুন কুকীর্তি করছে, শিবকালীবাবু ভাবতে লাগলেন।

শীলা বুলাকে বললেন, পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

শীলা বললে—কিন্তু বাবা, ছেলেটি বলেছে বাবীকে খবর দিতে। তাই দাও না। বাবীর স্বামীও ত পুলিশের লোক। তিনি এসে যা হয় করবেন।

সত্যি কথা। শিবকালীবাবুর মনে হল—মন্দ বলেনি। বললেন—করো তোমরা ফোন। আর দেরী কোরোনা। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, তবু বাবীর ঘুম ভাঙেনা।

এ পাশ ওপাশ ক'রে স্বপ্নের জের আরো খানিকটা টানতে চায়।

ঘুমের ঘোরে একটি সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে আজ সে প্রদীপকে দেখেছে, চঞ্চল ক্লান্ত প্রদীপ। কী যেন তাকে বলতে চায়, অথচ কথা যেন তার বন্ধ হ'য়ে গেছে। একটা চমৎকার ফুল-বাগানের পাখীর গানের মধ্যে যে স্বপ্ন আরম্ভ, তার এমন পরিণতি কেন?

অভিযান্ত্র বঙ্গ

চম্কে উঠে পাশ ফিরে সে আর একটা ভালো স্বপ্ন দেখবার আয়োজন করছে, সেই ভালো স্বপ্নটা কিছুতেই পরিষ্কার হ'য়ে ফুটছে না। বাধার পর বাধা। স্বপ্নে আবার এলো প্রদীপ, একটা নদীর ওপার থেকে তাকে ডাকছে, কিছুতেই বাবার উপায় নেই। ঝড়ে নদী ফুলে উঠেছে, বাবীর মন ছলে উঠেছে, কিন্তু প্রদীপ তবু চৌঁচিয়ে চলেছে।

ঘরের কোণে ফোন বেজে উঠলো।

তপনের খাটের কাছে। সেই উঠে আগে ধরলো।

বললে—কে ?

উত্তর এলো—আমি শীলা, বাবীকে চাই।

কী ব্যাপার ?

ব্যাপার তাকে বলব।

ও, দিচ্ছি। বাবীকে ডাক দিলে তপন।

ফোন ধ'রে বাবী শুনলে—আমি শীলা, বাবী শোন, আমাদের পাশের বাড়ীতে সেই নোটোরিয়াম বাড়ীতে প্রদীপ ব'লে একটি ছেলে বন্দী হয়ে আছে—

বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো বাবী—প্রদীপ ?

হ্যাঁ, সে বলছে তোকে বলতে—তোমার প্রদীপ বিপদে পড়েছে। কে রে তোর ? ভাই টাই কেউ বুঝি ?

ভাইয়ের চেয়েও বেশী। আমার অনেক কালের বন্ধু। আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।

আভিজাত্য বংশ

তখন তপনকে ডেকে বললে, প্রদীপ বিপদে পড়েছে, সেই সেই প্রদীপ, যার কথা তোমায় অনেক বলেছি। বন্দী আছে শীলাদের পাশের বাড়ী। উদ্ধার করো তাকে। গাড়ী বার করো।

তপনের বয়স এবং অভিজ্ঞতা ছুই-ই হয়েছে। সে অত ভাবপ্রবণ নয়। বললে—দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়েনা। থানায় ফোন ক'রে সব ব্যবস্থা করছি, ব'লে দিচ্ছি বাড়ীটার ওপর নজর রাখতে। যেন নিরে স'রে না পড়ে। আমি একটু বেলায় গেলেই হবে, চা-টা খেয়ে।

বাবী ওকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলো না, এক্ষনি যেতে হবে, নইলে অঘটন ঘ'টে যেতে পারে।

তপন আগে থানায় ফোন করলো।

আকাশে তখন কালো মেঘ উঠেছে, এলো চারিধার অন্ধকার হয়ে।

সকালবেলার সূর্য্য দেখা গেল না।

ঝড় আর জলে এলাহাবাদ শহর স্নান করতে লাগলো।

ওদের মোটর যখন জলে ঝাপসা যমুনাতীরের রাস্তা ধ'রে কালো অন্ধকারের মধ্যে সেই বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন থানা থেকে সিপাহী এসে গেছে, কিন্তু সদর হাঁ-হাঁ করছে খোলা, তিনতলা অবধি সব শূন্য।

বাবীর চোখে তখন আগুন জ্বলছে।

আজিগু বঙ্গ

বল্লে, আমি বলেছিলাম আর একটু তাড়া করতে না ?
দেবীর জন্তেই সব পণ্ড হ'য়ে গেল।

তখন ও অপ্রস্তুত।

বল্লে—এলাহাবাদ থেকে বেরিয়ে যাবার অনেক রাস্তা
আছে। সব রাস্তায় পাহারা বসান্নি। যদি শহর থেকে
এখনো বেরিয়ে গিয়ে না থাকে তাহলে ধরা পড়বে। আর
যদি আর কোনো বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে, তাহ'লেই ঝগাট
বাড়ারে।

ফোন্ হাতে নিয়ে ব্যবস্থা করতে দেবী হল না।

বাবী আর শীলা গল্প করতে বসলো, একটুখানির জন্তে
এতটা কাণ্ড হ'য়ে গেল !

তখনো দিগন্ত অন্ধকার ক'রে বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে, তখনো
আমের বনে জামের বনে ঝড়ের মাতামাতি।

থানা থেকে খবর পেয়ে প্রণব গিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়েছে
রেলপুলিশের সঙ্গে।

জলপুলিশ নদীর ধারে পাহারা দিচ্ছে।

সেই দুর্ঘ্যোগের দিনে বাবীর মনের দুর্ঘ্যোগের তুলনা হয়
না, তুলনা হয় না বিক্ষাচলের শূন্যপুরীতে বিশ্বেশ্বরের
চঞ্চলতার। মানুষের জীবনে এক একটা দিন এমন বিলী
আসে, যে সেদিনের কাহিনী সারা জন্মে ভোলা যায় না, কিন্তু

অভিশপ্ত বৃক্ষ

আরামকেদারায় ব'সে ছাপার অক্ষরে যারা সে ইতিহাস পাঠ করে, তারা ভাবে রোমাঞ্চটা আরো কেন ভয়ঙ্কর হল না !

কলমের একটি খোঁচায় এলাহাবাদ থেকে আবুপাহাড় চ'লে যাওয়া যায়, কোথায় গঙ্গাযমুনাসঙ্গম, আর কোথায় রাজ-পুতানার আরাবল্লী পর্বতমালা ।

কিন্তু যে বিধাতার লেখনীতে পৃথিবীর উপন্যাস তৈরী হয়, তিনি আরো অসাধ্যসাধন করতে পারেন মুহূর্তের মধ্যে, উৎসব-মুখরিত পম্পেয়াইয়ের ধ্বংসস্থপে সে কথা গাঁথা আছে ।

আমার এ ছোট কাহিনীর আর বেশী দূর নেই । যারা উৎসুক হ'য়ে উঠেছ, যারা শ্রান্ত হয়ে উঠেছ, তাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না । অভিশপ্তবংশের যবনিকা নেমে এলো ব'লে ।

বৃষ্টি তখন একটু ধরেছে, আকাশ ঈষৎ পরিষ্কার হয়ে আসছে, একটা রূপালী উজ্জ্বল আলো জলেস্থলে ঝলমল ক'রে উঠেছে ।

বাবী ব'সেছিলো উৎকর্ণ হ'য়ে শীলা বুলাকে দুইপাশে নিয়ে ।

গ্রামের সঙ্গিনী হানু, রানু, বিভা, অপর্ণা, ইন্দিরা, গৌরী, অঞ্জলি, বাসন্তী, মায়া, মঞ্জুশ্রী, নমিতা, গীতার কথা ভেবে অন্ত-মনস্ক হবার চেষ্টা করছে, কোথায় তারা কতদূরে ! কিন্তু

অভিশপ্ত বৃক্ষ

সকলকে ছাপিয়ে প্রদীপ ।

খবর এলো—বেনারস যাবার রাস্তায় লাল পোল থেকে নাববার মুখে সন্দেহবশতঃ একটা মোটর আটকানো হ'য়েছিল, তারা স'রে পড়বার চেষ্টা করতে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে, মারা গেছে দাগী গুণ্ডা চিরঞ্জীলাল, জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেছে সঙ্গের ছেলেটি মাথায় চোট লেগে । এতক্ষণ আছে কি নেই ! নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ভীষণ ।

পড়ি-কি-মরি ক'রে বাবী এসে বসলো গাড়ীতে, তপন ষ্টার্ট দিলে ।

যে রাস্তা দিয়ে শটকাট করতে যাচ্ছিল, গিয়ে দেখলে সে পথ মেরামতের জন্তে বন্ধ । গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে অনেকটা ঘুরে যেতে হল ।

ততক্ষণে অ্যান্থোলেন্স এসে প্রদীপকে হস্পিটালে নিয়ে গেছে ।

সিপাহী বললে, গাড়ীর আরোহীদের সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সে থামাতে বলে । সে কথা না শুনেই গাড়ী এগিয়ে যায়, তখন অগত্যা তাকে গুলি ছুঁড়তে হয় ।

প্রথম গুলিতেই চিরঞ্জীলাল মারা পড়ে, যার মৃতদেহ রাস্তায় গাড়ীর পাদানীতে রক্তাক্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে ।

সেই অবস্থায়ই গাড়ী এগিয়ে যায় দেখে ও বাধ্য হ'য়ে

আত্মশুদ্ধি

টায়ার পাংচার ক'রে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্রীজের রেলিংএ গিয়ে
গাড়ীর বনেট্ লাগে, প্রদীপ ছিটকে বাইরে পড়ে, লোহার
রেলিংএ ভীষণ আহত হ'য়ে সে অচৈতন্য হয়।

সঙ্গের লোকজনগুলোকেও ধ'রে হাজতে পাঠানো হয়েছে।

এই ইতিহাসটি শুনতে যতক্ষণ গেল ততক্ষণ বাবীর মন
চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে হস্পিটালে যাবার জন্যে। কিন্তু তার
স্বামীকেও পুলিশ অফিসার হিসাবে কর্তব্য করতেই হবে।
ভাবপ্রবণ হ'লে তাদের কাজ চলে না।

পৃথিবীতে আরো কম ভাবপ্রবণ হচ্ছে ডাক্তাররা। বাবী
যে ব্যস্ততা নিয়ে হাসপাতালে এলো সে ব্যস্ততা চিকিৎসকদের
কাছে অভ্যস্ত। তার অজস্র প্রশ্নের উত্তরে শুধু সে জানতে
পারলে প্রদীপের জ্ঞান এখনো হয়নি। বিপদের আশঙ্কা ত'
আছেই, কাটবে কিনা কিনা সে কথা বলবার এখনো সময়
হয়নি।

সেখানে ঘরে ঘরে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। একটা
বেডের পাশে আরেকটা বেডে মরণের শীতলস্পর্শ নেমে আসছে
যে কোনো দুহুর্ভে, তার পাশে যে কম্পমান জীবন, তার কী
অবস্থা হচ্ছে তা দেখবার কেউ নেই।

প্রণব প্রদীপের মাথার কাছে ছিল, ঘরে ভিড় বাড়ানো
ডাক্তারের নিষেধ ছিল।

বাবী বাইরে থেকে অস্থির হ'তে লাগলো।

আমডোকম আর রীতিং পাইতাকের উর বসে বসে

ভারাক্রান্ত ।

দূর শহর থেকে মানুষের কলহোল এখানে কোর উপস্থাপিত

মতন ভেসে আসে ।

তিন দিন বাদে প্রদীপ প্রলাপ বক্তে লাগলো—বাবী এসেছে ? বাবীকে কি খবর দেওয়া হয়েছে ?

মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বাবী বললে—আমি এসেছি প্রদীপ ।

প্রদীপ চিন্তে পারলে না । শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললে—বাবী আর দাছ কোথায় ?

দাছ পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন ।

বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমি এসেছি দাছ ।

ডাক্তার বললে—আপনারা দয়া ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যান । আমাদের কাজ করতে দিন ।

রাত আর দিন, দিন আর রাত—এতগুলি প্রাণীর ভগবানের কাছে অক্লান্ত আকুল প্রার্থনা অবশেষে মঞ্জুর হ'ল ।

প্রতুল চোখ চাইলে ।

কথা বললে ।

সেদিন বাবীর জ্বর, সে আসতে পারেনি ।

যে চিকিৎসক তাঁর সমস্ত বিজ্ঞা আর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে এই রুগ্ন কিশোরের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন—তাঁর

আভিষ্কার

নাম ডাক্তার অতুল রক্ষিত ।

বিশ্বেশ্বর বললেন, আপনার ঋণ কী ক'রে শোধ করব ?

পারেন যদি দেশে আরো বেশী হস্পিট্যাল ক'রে—ডাক্তার
স্বিতহাস্তে বললেন । আমাদের দেশে গরীবদের চিকিৎসা হয়
না, আপনারা ধনীরা একথা ভুলবেন না ।

প্রদীপের কাণেও একথা গেছলো ।

যে কদিন সে ক্যাবিনে ছিল, চারিধারের ব্যবস্থার
খোঁজ নিত ।

খবর নিয়ে তার এই কথাটি মনে হ'ল—আমাদের দেশে
আজো গরীবদের চিকিৎসা হয় না ।

বাবী সেদিন এসেছিলো—বললে—তা'হলে এত বড় বড়
হস্পিট্যালগুলো কী করতে আছে ?

প্রদীপ বললে—বড় বড় শহরের শোভা বাড়াবার জন্তে ।

সেরে উঠেও নিস্তার নেই ।

চিরঞ্জীলালের দলবলের বিচার শুরু হল । সাক্ষী দিতে
হবে তাকে । আসামীদের মধ্যে ছিল তার নকাকা আর নতুন
কাকা, আরো অনেকগুলি গুণ্ডা, খুন, রাহাজানি, লুঠতরাজ,
নোট জাল, আগুন লাগানো, যাদের কোনো পাপ বাদ
যায়নি ।

কয়েকজনের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কয়েকজনের ফাঁসি ।

আদিশু বংশ

মৃত্যুদণ্ড পেলে তার দুই কাকা, তারা নাকি সাতটা খুন করেছে।

দুনিয়ার আবর্জনা তারা, কিন্তু বিশ্বেশ্বর হাজার হোক বাপ, বড় কাতর হ'য়ে পড়লেন।

শিবরাত্রির শেষ শলতেটিকে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি মহলন্দপুরে ফিরে যাবার জন্তে ব্যস্ত হলেন।

দুর্জনের দিক থেকে তাঁর পৌত্রের আর ভয় রইলো না



মহলন্দপুর

বটে, কিন্তু মরণের কাছ থেকে তিনি কোনো ভরসা পাননি।

শাড়িশ্যু বঙ্গ

এত রুগ্ন আর দুর্বল সে হ'য়ে পড়েছে ইদানীং—তাকে রেখে তিনি যেতে পারলে হয় !

এবার তিনি যেতে চান, প্রস্তুত হ'য়ে আছেন । গঙ্গার ধারে নিজের বাড়ীতে এসে তিনি প্রণবকে জমীদারী ও সম্পত্তির সব কাগজপত্র বোঝাতে লাগলেন, উইল দেখালেন—তিন কোটি টাকার মালিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন মল্লিক বংশের শেষ ছেলেটিকে । একজিকিউটর হ'ল প্রণব ।

জীবনে তিনি অনেক কষ্ট পেলেন, তবুও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হ'ল ?

সে বুড়িটা এখন নেই যে ঝড়ের রাতে এসে চ্যাঁচাত—ফিরিয়ে দাও আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দাও আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দাও ! কিন্তু যে কোনো ঝড়ের রাতে তার প্রতিধ্বনি আছে ।

যেদিন তাঁর অসুখ করলো, সেদিন থেকে পথ্য এবং ওষুধ দুই তিনি বন্ধ করলেন, ডাক এসেছে যদি, আর তিনি সুযোগ যেতে দেবেন না ।

প্রদীপকে তিনি রেখে যাচ্ছেন যোগ্য শিক্ষকের হাতে এই তাঁর সবচেয়ে বড় সাক্ষনা ।

মৃত্যু যে মহান্ হয়, মৃত্যু যে সুন্দর হয়, হয় সূর্যাস্তের মতন মনোরম কখনো কখনো—এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি শুদ্ধ হ'য়ে যাওয়া দেখে প্রদীপ বুঝতে পারলো ।

আড়িৎ বৃক্ষ

তার প্রিয় লাইব্রেরী-ঘরে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করলেন প্রিয়তম পৌত্রকে শেষ আশীর্বাদ ক'রে।

তিন কোটি টাকার কিছু কিন্তু প্রদীপ পেলে না। তার নাবালকত্ব আগে অতিক্রম করা চাই।

সাধারণ ছেলেদের মতন সাধারণ বেশে প্রদীপ সাধারণ স্কুলে যেতে লাগলো।

ম্যাট্রিক পাশ করলো, বি-এ পাশ করলো।

তখনো তার কুড়ি বছর হয়নি।

লাইব্রেরী ঘরে প্রণব ভারী একথানা বই নিয়ে তন্ময় হ'য়েছিলো। প্রদীপ এসে বললে—টাকাটা বাড়াবার কি করছেন ?

সে কথা তোমার এখন না জানলেও চলে ! গম্ভীরমুখে প্রণব বললে।

আমার এক বন্ধু বলছে, কিছু শেয়ার কিনলে হয়।

নিজে কিনতে গেলে ঠকতে হবে, শেয়ার ডীলাররা প্রায়ই জোচ্চোর।

তাহ'লে গভর্নমেন্ট প্রামিসারি নোট কিনা ফিক্সড ডিপজিট ?

সে তোমায় ভাবতে হবে না।

প্রদীপ একটু বিরক্ত হ'ল। তার টাকা, সে কথা কইতে পাবে না। সাবালক হ'তে আর ক'মাসই বা আছে ?

মাড়িয়ে বৃক্ষ

প্রণব বুঝতে পেরেও কিছু বললে না।

চ'লে যাচ্ছে দেখে ডেকে বললে—এই লাইব্রেরীটা শেষ
করো। বিশ্বভারতীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের লাইব্রেরী দেখে
এসো। ইউনিভারসিটির চৌকাট না মাড়িয়েও একজন লোক
কি ক'রে মহামানব হ'য়ে উঠলেন, হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-
দের শীর্ষমণি, বহু পশ্চাতে ফেলে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-
ধারীদের, তার মূলতত্ত্বটি বুঝতে শেখো।

প্রদীপের কথাটা ভালো লাগলো না, সে বেরিয়ে গেল।

দক্ষুরা তাকে বিরক্ত ক'রে মারছে, তোর মাষ্টার সব সরিয়ে
ফেললে। যে দিন তোর হাতে বিষয় আসবে, দেখবি
সব শেষ!

প্রণবের চালচলন দেখে ওর সেট সন্দেহ ক্রমশঃ দৃঢ়তর
হতে লাগলো।

একুশ বছর পূর্ণ হ'তে যখন আর তিন মাস আছে, ও ঝড়ের
মতন এসে প্রণবকে বললে—কেন আপনি আমায় সব বুঝিয়ে
দিচ্ছেন না?

এখনো সময় হয়নি।

সময় কবে হবে মাষ্টার মশাই, যেদিন আপনি সব শেষ
ক'রে দেবেন?

প্রণব একটীও কথা না ব'লে বইয়ের পাতা ওপ্টাতে
লাগলো।

অভিশপ্ত বংশ

একশ বছর যেদিন পূর্ণ হল, প্রদীপকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণব তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দিলে—তিন কোটি টাকা হ'য়ে গেছে চার কোটি, আর জমিদারী বেড়ে গেছে দ্বিগুণ।

পায়ে প'ড়ে প্রদীপ বললে—আমায় ক্ষমা করুন।

প্রণব বললে—ক্ষমা নেই, গড়তে চেয়েছিলাম রত্ন, হ'লে আবর্জনা।

আপনার প্রাপ্য নিয়ে যান। বলতে গেলে এ এক কোটি টাকার কিছুটা আপনার প্রাপ্য।

যতটা আমার প্রাপ্য, তাইতে হাঁসপাতাল ক'রে দিয়ে—মাতৃসদন, অনাথ-আশ্রম যা পারো। সেই ডাক্তারের কথা মনে করো—বড় গরীব আমাদের দেশ।

ওদিকে বন্ধুরা মোটর নিয়ে ডাকাডাকি করছে, প্রদীপ আর দাঁড়ালো না, কথা বাড়ালো না।

ফুর্তিতে বদখেয়ালে আড্ডায় খোলামকুচির মতন ঝকঝকে টাকা চক্চকে নোট উড়ে যেতে লাগলো—বিশ্বেশ্বরের কষ্টসঞ্চিত আর বহুজনের দীর্ঘশ্বাসে কলুষিত অর্থ।

কলকাতা থেকে কাশ্মীর সেই টাকার ভোজবাজী দেখলো। অভিশপ্ত-বংশের শেষ প্রদীপের কুকীৰ্ত্তি দেখে বিশ্বেশ্বরের অভিশপ্ত আত্মার কী মনে হয়েছিল সে কথা কেইবা জানে?

যখন নগদ টাকা আর জমিদারীর অল্পই অবশিষ্ট আছে,

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, তখন একদিন প্রদীপের মনে পড়লো—
সে কোথায় চলেছে। চলেছে ধ্বংসের পথে, চিরব্যর্থতার পথে,
অমানুষের পথে।

সেদিন সে সর্বস্ব ফুইয়ে এক হস্পিটাল করলো। কটাই
বা বেড্ হ'ল!

কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—প্রণববাবুর জন্ম।

তাকে পাওয়া গেল না।

বাবীকে ডাকলে—মেট্রন হ'তে।

সে এলো না। সে পরের ঘরের বো।

তাছাড়া সমস্ত খবর তার কাছে পৌঁছেছিল।

তার মতন কষ্ট কেউ পায়নি।

সমাপ্ত



